বঙ্গ ও আসামের

পীর আউলিয়া কাহিনী

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী
জনাব, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ সুফী, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার" ও
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
পঞ্চম মুদ্রণ - ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য- ৮০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين *

বঙ্গ ও আসামের

পীর আওলিয়া কাহিনী

যাহারা বঙ্গের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহারা কেবল বাদশাহগণের যুদ্ধ দেশজয় ও বাহ্যিক ব্যাপারগুলির আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিশাল বঙ্গ ও আসামের অধিবাসীবৃন্দ কিরূপে ইছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তরবারী-বলে যে এদেশে ইছলাম প্রচার করা হয় নাই, ইহা ধ্রুব সত্য, তরবারী-বলে কি মানবকুলের হৃদয় আকর্ষণ করা সম্ভবপর হয়? ইহার প্রকৃত কারণ ইহা ব্যতীত আর কিছু নহে যে, গাজি সুলতান মাহমুদ গজনবীর হিন্দুস্তান জয় করার পর হইতে দলে দলে বড় বড় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পীর অলি বঙ্গ ও আসামে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নানা অলৌকিক-ক্রীয়া (কারামত) দর্শনে জনসাধরণ ইছলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং পূর্ব্বপুরষগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ইছলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরব ও আজমের বিভিন্ন স্থানের পীর অলিগণের বিস্তৃত জীবনী তথাকার আলেমগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গ-আসামের ইসলাম প্রচারের প্রধান অবলম্বন বহু শক্তিসম্পন্ন পীরগণ গোরশায়ী হইয়া আছেন, তাঁহাদের জীবনী বঙ্গ-আসামের বিদ্যানগণ লিপিবদ্ধ করেন নাই, মুছলমানেরা

তাঁহাদের সংবাদ বড় কিছু অবগত নহেন, তাঁহাদের জন্য কেহই ছওয়াব রেছানি পর্য্যন্ত করেন না, তাঁহাদের আত্মা এজন্য দুঃখিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এই কারণে এই পীর-অলিগণের নিকৃষ্ট খাদেম তাঁহাদের জীবনী প্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিশ্বাস ভাজন লোকদের মুখে যাহা তাহাদের কারামত ও জীবনী শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম, লোক পরম্পরায় যে সমস্ত ঘটনা শুনা যায় তাহার সমস্তই যে একেবারে অকাট্য সত্য, আমি এরূপ দাবী করি না, কিন্তু ইহার অনেকটার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বিকার করার উপায় নাই। একদল লোক পীরগণের কারামত বিশ্বাস করেন না, তাহাদের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, কোরআন শরিফে অতি অল্প সময়ে বিলকিছের সিংহাসন আনয়ন করার কথা আছে। অসময়ে হজরত মরয়েমের খোর্ম্মাফল পাওয়ার কথা আছে। হাদিছ শরিফে অকাট্য প্রমাণে এইরূপ অনেক কারামতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমি সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াও সমস্ত স্থানের পীর-অলীগণের সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই, যদি কোন মেহেরবান ইহার পরে কোন স্থানের পীর অলীর জীবনী লিখিয়া পাঠান, তবে আমি উহা সাদরে গ্রহন করিয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিব। প্রত্যেক জেলার পীরগণের নাম পৃথক পৃথক অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল। যদি কেহ লিখিত ঘটনার কিছু কমবেশী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে আমাকে জানহিলে, দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া লইব। যাহারা এই কেতাব খানি পাঠ করিবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনবার ছুরা ফাতেহা, দশ বার ছুরা এখলাছ, ১১ বার দরুদশরিফ পড়িয়া বঙ্গ আসামের সমস্ত পীর অলীর উপর ছওয়াব রেছানি করিতে ভুলিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ।

প্রথম অধ্যায়

নোওয়াখালী-১

১) হাজিগঞ্জ ষ্টেশনের ১০/১২ মাইল দক্ষিণে নওয়াখালী জেলার অধীন কাঞ্চনপুর গ্রামে সৈয়দ হাফেজ মাওঃ আহমদ তান্নুরি তাওয়াক্কোলী ওরফে সৈয়দ মিরান শাহ সাহেবের মাজার আছে। ইনি হজরত মাওঃ সৈয়দ আজাল্লা (রঃ) ছাহেবের পুত্র, তিনি হজরত বড় পীর সৈয়দ মহিইউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (কোঃ)র পুত্র। যখন বাদশাহ হালাকু খাঁ বাগ্‌দাদ শরিফ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, শহর উৎসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা যেন ছোট কেয়ামতের দৃশ্য ছিল, সেই সময় হজরত বড় পীর সাহেবের অনেক বংশধর রুম, শাম কান্দাহার, কাবুল, পারশ্য, হিন্দুস্তান ও বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। হজরত মাওঃ সৈয়দ আজাল্লা (রঃ) ফিরোজ শাহের জামানায় হিন্দুস্তানে আসিয়া বাসস্থান স্থির করিলেন। হজরত মাওঃ সৈয়দ আহমদ তান্নুরি দিল্লীতে পয়দা হইয়াছিলেন, তিনি নিজের ওয়ালেদ সাহেবের নিকট জাহেরি ও বাতেনি এলম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, আরও অন্যান্য পীরগণ হইতে বাতেনি ফয়েজ লাভ করিয়া কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরিকার খেলাফত পাইয়াছিলেন। এই হজরত, পীর জোনাএদ বাগ্‌দাদীর ন্যায় অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক বহু কারামত প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি শাম, মদিনা ও মক্কাশরিফের পরীগণের নিকট ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ওয়ালেদ সাহেব হালাকু খাঁর মৃত্যুর পরে বগ্‌দাদ শরিফে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি দিল্লীতেই থাকিয়া গেলেন। হজরত সৈয়দ আহমদ তান্নুরি (রঃ) অধিক সময় বন্দিগীতে কঠোর সাধ্যসাধনা করিতেন এবং প্রবল জজবা ও আত্মহারা অবস্থায় থাকিতেন। ফিরোজ শাহ হজরত সৈয়দ ছাহেবের ওয়ালেদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন, তিনি এই হজরত সাহেবকে

আহ্বান করিয়া মহা সম্মান করিলেন। ইনি শ্যামল বর্ণের ছিলেন, অন্য একজন বোজর্গ হিংসাপরবশ হইয়া বলিলেন, সৈয়দ কখন কাল হয় না এবং ডেক্ কাষ্ঠের হইতে পারে না। নিজের সুন্দর চেহারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজেকে হজরত গওছে পাকের বংশধর হওয়ার দাবি করিয়া বসিলেন। হজরত সৈয়দ ছাহেব কোপভরে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি কম্পিত হইলেন, তিনি বলিলেন, এই ফকির গওছে আজমের বংশধর যদি তোমরা গওছে-পাকের কারামত দেখিতে চাও, তবে উনানে অগ্নি জ্বালাও, ডেকে তৈল নিক্ষেপ কর। আমাকে এবং উক্ত দাবিদারকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ কর, তৎপরে তোমরা দেখিতে পাইবে, যে ব্যক্তি গওছে পাকের বংশধর হয়, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিবে না। যখন হজরত এবরাহিম (আঃ) নমরুদের অগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তখন হজরত নবি (ছাঃ) এর বংশধরগণ নিশ্চয় নিষ্কৃতি পাইবেন। তৎপরে বাদশার আদেশে উনানে অগ্নি জ্বালান হইল ও ডেকে তৈল পূর্ণ করিয়া গরম করিয়া উভয় বোজর্গকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। সেই হিংসুক দাবিদার ব্যক্তি উহার মধ্যে ভস্ম হইয়া গেলেন এবং হজরত সৈয়দ আহমদ গাওয়াকোলি হজরত এবরাহিম (আঃ) এর ন্যায় উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি কয়েক দিবস পরে অক্ষত দেহে আল্লাহো আকবর শব্দ বলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ফিরোজ শাহ তাঁহার অতি ভক্ত হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে বাস করার অনুরোধ করিলেন। তাঁহার উপর এলহাম হইল যে, তুমি বঙ্গদেশে গমন করিয়া বাসস্থান কর এবং তথায় ইছলাম প্রচার কর। সেই সময়ে হজরত শাহ জালাল মোজার্রাদ এমনি শ্রীহট্টে এবং হজরত শাহ আলি ঢাকাতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। হজরত সৈয়দ আহমদ তান্নুরি সাহেব বাদশাহকে বলিলেন, আমার এই স্থানের লোকালয় পছন্দ হইতেছে না, আমি বঙ্গদেশে গমন করিব। আমার অনুরোধ, আপনি সমস্ত বন্দীকে

নিস্কৃতি প্রদান করুন। বাদশাহ বন্দিদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁমার পাতে অম্বিত করিয়া দিলেন, বঙ্গদেশে সৈয়দ তান্নুরিছাহেবের যতটা জমির আবশ্যক হয়, উহার খাজনা মাফ। বন্দিগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সঙ্গী থাকিতে দরখাস্ত করিলেন। হজরত ছাহেব তাহাই মঞ্জুর করিলেন। হজরত সৈয়দ ছাহেব সর্ব্বশুদ্ধ বার জন আওলিয়া প্রথমে পাণ্ডুয়াতে আগমন করেন।

গৌড়ের ইতিহাসে আছে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (হিজরীর সপ্তম শতাব্দীতে) বার জন আউলিয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে ইছলাম প্রচার করিতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে বখতিয়ার মৈসূর সন্দ্বীপে বাস করেন, রোহিনী নামক স্থানে মোগল এই ফকিরের আস্তানা আছে। অবশিষ্ট অলিগণের নাম উহাতে লিখিত হয় নাই। সৈয়দ আহমদ তান্নুরি তাঁহদের তৃতীয একজন, পাণ্ডুয়া সংবাদ পত্রে এই হজরত ব্যতীত অবশিষ্ট ১৫ জন পীরের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। ইনি কোফর ধ্বংস করিতে করিতে পাণ্ডুয়া হইতে নওয়াখালীর সোনাপুর বাগের নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি খড়ম পায় দিয়া নদীর উপর চলিতেছিলেন, আর নদীচর হইয়া যাইতেছিল, একটী গ্রাম ও কয়েকটি গোলাকার পুষ্করিণী হইয়া গিয়াছিল। কিছু স্থান চলিতে বাকি ছিল, এমতাবস্থায় একজন জেলের সহিত হজরতের সাক্ষাৎ হয়, তিনি জেলেকে ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন, সে নিজের স্ত্রীর নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া মরিয়া যায়। তৎপরে তিনি সোনাপুরের নিকট অন্য স্থানে চলিতে লাগিলেন, জমি উচ্চ হইয়া যাইতেছি, উহার নাম রূপাপুর বাগ হইল। তৎপরে তিনি কাঞ্চনপুরে বাসস্থান স্থির করিলেন। ইহা প্রায় ৬৫০ বৎসর অতিত হইয়াছে।

এক দিবস তিনি আছরের পরে বাটীর পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, মগরেবের নামাজ নষ্টপ্রায় হইতেছিল। তিনি

মোবারক যষ্টিখানা জমির উপর মারিলেন, ইহাতে জমির নীচে হইতে পানি প্রবাহিত হইল। হুজুর ওজু করিয়া নামাজ পড়িলেন, তাঁহার পুত্র মৌলবী শাহ্ আমানুল্লাহ ছাহেব ও মৌলবী শাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চিহ্ন রাখিবার জন্য ইহা বড় আকারে খনন করাইয়াছিলেন, উহা খোদাই পুষ্করিণী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আমাদের বঙ্গদেশে তিনিই নারিকেল আনায়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে দেশে গমন করেন নাই, তথায় নারিকেল কম হইয়া থাকে, যেরূপ কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে নারিকেল কম হইয়া থাকে। কাঞ্চনপুরে লাল রঙের এক প্রকার নারিকেল বেশী পরিমাণ হইয়া থাকে, উহা মিরানি নারিকেল নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই নারিকেল অতি মিষ্ট ও সুস্বাদু হইয়া থাকে।

হজরত ছাহেবের ভগ্নী প্রসিদ্ধা মজযুবা বিবি, ইহার মাজার তাঁহার মাজারের নিকট, কিন্তু ইহা পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড়ে একটী গাছের নীচে আছে, যে কেহ তাঁহার কবরের নিকট কোন মতলবের জন্য উপস্থিত হয়, তিনি দোয়া করিয়া থাকেন, কোন্ কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তথায় জিয়ারতের জন্য গেলে, প্রথমে উক্ত মজযুবা বিবির জিয়ারত হইয়া থাকে, পরে হজরত সৈয়দ মিরান ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাঁহার জিয়ারত দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়, তৎখণাৎ হজরত বড়পীর ছাহেব ও হজরত নবি (ছাঃ) এর সহিত সে ব্যক্তির জিয়ারত নছিব হইয়া থাকে। আর যদি তাঁহার কাশ্‌ফের শক্তি না থাকে, তবে স্বপ্নযোগে তাঁহাদের জিয়ারত হইয়া থাকে।

১৩১৯ সালে সবরেজিষ্ট্রার মৌলবী আছগার আলি ছাহেবের কন্যা মারাত্মক ব্যধিগ্রস্তা হইয়া পড়েন ডাক্তারেরা তাঁহার চিকিৎসা করা ত্যাগ করিয়া বসিলেন, এমন কি মৃত্যু যন্ত্রণার সময় নিকট হইল। মৌলবী খলিলোর রহমান ছাহেব নিজের মুরিদা স্ত্রীলোকের

কন্যার এই অবস্থা শ্রবণে দাএরা শরিফে গিয়া হজরত মিরান শাহ ছাহেবের গোর শরিফে ঝাড়ু দিয়া তাঁহার রুহে ছওয়াব রেছানি করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের পীড়া দুরীভূত হওয়ার দোয়া করিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন, এক ঘন্টার মধ্যে তাহার সমস্ত ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, যেন ব্যাধিশূন্য হইয়া গিয়াছেন। নোওয়াখালীর বড় ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এখন কোন পীড়া নাই। এই কার্য্যের পুরষ্কার স্বরূপ সবরেজিষ্ট্রার সাহেবের স্ত্রী আয়তন্নেছা বিবি তাঁহার বাড়ীতে জেকেরকারীদিগের জন্য টীনের ছাদের একটা খানকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, উহার নাম দাএরায় আহমদ মিরানী রাখা হইয়াছে।

হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবের মাজার শরিফের উত্তর দিকে একটী কাঁঠাল গাছ ছিল, খাদেমেরা উহা কাটিয়া ফেলিয়া ছিল, সেই দিবস (খাদেম) মুনশী গোলাম আলি পুষ্করিণীর কিনারায় গিয়াছিলেন, যেন কেহ তাহাকে ধরিয়া জমিতে নিক্ষেপ করিলেন, তিনি অচৈতন্য অবস্থায় কয়েক দিবস মরণাপন্ন অবস্থায় রহিয়া গেলেন। তাহার ছোট ভাই রাত্রে প্রস্রাব করার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, প্রায় ৩০০ গজ দূরে স্থিত পুষ্করিণীর পাড় হইতে যেন কেহ হস্ত লম্বা করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, ছেলেটা চীৎকার করিতেছিল, এদিকে তাহার পিতা মাতা মস্তক ঠুকিয়া রোদন করিতেছিল এবং তাহার হাত ধরিয়াছিল, চারিদিকে লোকেরা সমবেত হইল, ছেলেটা অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া গেল। এইরূপ প্রত্যেক রাত্রেই চীৎকার কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। দরগা শরিফের মধ্যে হইতে আশ্বারোহিদিগের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, বে আদবেরা বাহির হইয়া যাও, বে-আদবেরা বাহির হইয়া যাও, এইরূপ শব্দ শুনা যাইত। একরাত্রে দহলিজে কয়েকজন লোক শুইয়াছিল, কতকগুলি অশ্বারোহী আসিয়া আক্রমণ করিলে, তাহারা সকলেই তথা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অবশেষে সমস্ত

স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোক রওজাশরিফে উপস্থিত হইয়া কিছু পড়িয়া হজরতের রুহে ছওয়াব রেছানি করিয়া নিজেদের কৃত অপরাধ হইতে তওবা করিলেন, তৎপর হইতে উক্ত বিপদ দূরীভূত হইয়া গেল, ইহা ১৩১৬ হিজরীতে ঘটিয়াছিল।

উক্ত দেশে ধান্যে পোকা লাগিয়া থাকে, হজরত মজযুবা বিবির মজারের নিকট বাঁশ গাছ আছে, যদি কেহ তথায় গিয়া ইহা বলেন, হে মকদুমা বিবি, আমি পাঁচটা কুঞ্চি লইয়া ক্ষেত্রের চারিদিকে চারিখানা ও উহার মধ্যস্থলে একখানা পুতিয়া দিব, আপনি দোয়া করুন, খোদা যেন ইহার বরকতে আমার ধান্য গাছকে পোকা হইতে রক্ষা করেন, আমি এই কুঞ্চিগুলি ফেরত দিয়া যাইব, এইরূপে উহা ক্ষেতে পুতিয়া দিলে, ধান্যে পোকা লাগেনা। যদি সে কুঞ্চি ফেরত না দেয়, তবে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি উপস্থিত হয়। একজন খাদেম নিজের দরকারি কার্য্যের জন্য বাঁশ কাটিতে গিয়াছিল, কতকগুলি বাঁশ কাটিয়া তৎসমস্ত ছাড়াইয়া দিতে অন্য বাঁশের উপর উঠিয়াছিল, কেহ যেন তাহাকে পদাঘাত করিয়া অচৈতন্য করিয়া ফেলিয়া দিল।

এক ব্যক্তি হজরত মখদুমা ছাহেবকে না বলিয়া কুঞ্চি কাটিয়াছিল, ইহাতে কুঞ্চি হইতে রক্ত বাহির হইয়াছিল। একব্যক্তি তেঁতুলের ডাক কাটিয়াছিল, উহা হইতে রক্ত বাহির হইয়াছিল।

ইউছুফ আলি নামক একজন লোক উন্মাদ হইয়াছিল, তাহার দাদা তাহাকে রওজাশরিফে লইয়া ঝাড়ু দিয়া উক্ত ঝৌটা-দ্বারা উন্মাদকে মারিতে মারিতে বলিয়াছিল, হজরত ছাহেব, আপনি খোদার নিকট ইহার আরোগ্যের জন্য দোয়া করুন। কয়েক দিবসেই সেই উন্মাদ সুস্থ হইয়া যায়।

একজন লোক একজন অত্যাচারির হাতে বিপন্ন হইয়া পড়িল, কিছু টাকা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল।

অবশেষে উভয়ের মধ্যে এইরূপ চুক্তি হইল যে, হজরত মিরান শাহ সাহেবের গোর স্পর্শ করিয়া হলফ করিয়া টাকা উঠাইয়া লইতে হইবে। উভয়ে রওজা শরিফে উপস্থিত হইল, অত্যাচারি ব্যক্তি হলফ করিয়া টাকাগুলি উঠাইয়া লইল। তৃতীয় দিবসে সে কোন মোকদ্দমায় পড়িয়া দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইল। এক ব্যক্তি হজরতের রওজাশরিফে হাত রাখিয়া মিথ্যা হলফ করিয়াছিল, তাহার মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল, অবশেষে সে ইহাতে মরিয়া গেল। চৌধুরি মোহাম্মদ গাজি ওরফে বাবা মিয়া নিজের পিতা চৌধুরি মোহাম্মদ গাজি ছাহেবের সঙ্গে বাল্যকালে দরগা শরিফে গিয়াছিলেন, সে জুতা পায় দিয়া তথায় গিয়াছিল, উহাতে চৌধুরি সাহেব তাহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তিনি উক্ত জুতা গৃহে আনিয়া বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন; ইহার পরে চেষ্টা করিয়া উক্ত জুতা পাওয়া গেলনা। যদি কোন মুরিদ কঠিন হৃদয় হয়, রওজাশরিফে উপস্থিত হইলেই তাঁহার কলব জারি হইয়া যায়।

রওজা শরিফের নিকট একটী পুষ্করিণী আছে, কেহ উহাতে ওজু করিলে, কোন ক্ষতি হয় না, কেহ গোছল করিতে ইচ্ছা করিলে, পানি উঠাইয়া গোছল করিতে হয়; যদি কেহ উহাতে নামিয়া গোছল করে, তৎক্ষণাৎ সে রোগগ্রস্থ হইয়া থাকে। যদি কেহ দরগার সীমার মধ্যে অজানিত ভাবে প্রস্রাব করে তবে মুত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর পাড়ে তাঁহার স্ত্রীর ও অন্যান্য আওলাদের কবর আছে। লোকেরা গণনা করিলে উহার সংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে। তাঁহারা ১২ জন আওলিয়া একত্রে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে হরিচ্চরে মিয়া ছাহেব বাগদাদীর মজার আছে, আর ত্রিপুরার অধীন শ্রীপুর গ্রামে রাস্তি শাহ নমাক এক বোজর্গের মজার অছে।

১৩১৯ হিজরীতে উক্ত রওজাশরিফে হজরত বড়পীর ছাহেবের

ঈছালে ছওয়াব চৌধুরী সৈদয় আবদুল গফুর ছাহেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাতে তিনি হজরত মিরান শাহ, গওছে-পাক, হজরত নবি (ছাঃ) ও সমস্ত নবীর সহিত জিয়ারত লাভ করিয়া ছিলেন। এইরূপ অনেক লোক হজরত মীরান ছাহেব ও নবি (ছাঃ) কে একত্রে দেখিয়াছিলেন। হজরত মীরান শাহ সাহেবের বংশধরগণের মধ্যে তিনজন লোক বর্ত্তমানে আছেন, জনাব সৈয়দ আবদুল গফুর চৌধুরি, জনাব মৌলবী সৈয়দ আবদুল মজিদ সাবরেজিষ্টার ছাহেব ও জনাব মোহাম্মদ মিঞা চৌধুরি সাব-ম্যানেজার ছাহেব। ইহাঁদের বাটী হজরত মিরান ছাহেবেরে দাএরা শরিফের সন্নিকটে আছে। ফিরোজ বাদশাহ তাঁহাকে যে জমিদারি প্রদান করিয়াছিলেন, এখনও উক্ত তিন ছাহেবের অধিকার ভুক্ত অছে, কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেন্ট উহার উপর কর ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীর বংশধরগণের মধ্যে মৌলবী চৌধুরি, আহম্মদ গাজি ওরফে বাবা মিঞা ছাহেব বর্ত্তমান আছেন, ইনি রূপশার জমিদার চৌধুরি মোহাম্মদ গাজী ছাহেবের পুত্র।

(২) রূপশার পূর্ব্বে-দক্ষিণ নওয়াখালী জেলার অন্তর্গত হরিচ্চর মিঞা বাড়ীতে হজরত আহছান কিম্বা হাছান শাহ নামক একজন মস্ত ওলীর মজার আছে, তিনি প্রথমে কাউনিয়া হোছেন ভুঞার দীঘির পাড়ে থাকিতেন, লোকে তাঁহার জেকর শুনিয়া বিদ্রুপ করিত ভুঞাদিগের বাড়ীর কোন লোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি একটা বালিহাঁস খাওয়াইতে পারেন কি? সে কয়েক দিবস এইরূপ বলার পরে এক দিবস তিনি একদল উড্ডীয়মান বালিহাঁসকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বলায় অমনি উহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তিনি সেই ভুঞাকে বলিলেন, তুমি উহাদের কোন একটিকে জবাহ কর, সে ব্যক্তি একটি বলিহাঁস জবহ করিলে, অন্যান্য হাঁসগুলি উড়িয়া বৃক্ষের উপর বসিয়া থাকিল। তৎপরে সেই জবহ করা হাঁসটির অস্থিগুলি পৃথক করিয়া

রাখা হইল, হাঁস-মাংস রন্ধন করা হইল, কিন্তু অস্থিগুলি পৃথক করিয়া রাখা হইল, উহা খাওয়ার পরে আবৃত অস্থিগুলি খুলিয়া দেখা হইল যে সেই হাঁসটি জীবিত হইয়া অন্যান্য হাঁসের সহিত উড়িয়া গেল। তিনি কিছুকাল পরে লোকের জনতার জন্য বিরক্ত হইয়া হরিচ্চরের দিকে রওয়ানা হইলে, হরি তেলিকে ক্ষেয়া নৌকায় তাঁহাকে পার করিয়া দিতে বলিলেন, সে পয়সা চাহিলে, তিনি নদীর উপর হাটিয়া পার হইয়া গেলেন, তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন, সেই স্থানের নদী চর হইয়া গেল। তিনি হরি তেলিকে নিজের বাড়ী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, সে ইহাতে রাজি হইল না। হরি তেলি ধান্য ভানিতে গেলে, ঢেকির সহিত জোড়া লাগিয়া থাকিত, এইরূপ অনেক কারামত দেখিয়া অবশেষে সে বলিল, আমার নামে এই গ্রামটির নামকরণ করা হইলে, আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজি আছি। শাহ ছাহেব তাহাই স্বীকার করিলেন, সেই হইতে সেই গ্রামের নাম হরিচ্চর হইল।

তাঁহার পানের চাবাতে সুপারি গাছ হইয়াছিল, সেই গাছের সুপারীর ভিতরে সেইরূপ চাবান সুপারী দেখা যাইত। তিনি কাঁঠালের কাষ্ঠের খড়ম ব্যবহার করিতেন, উহা হইতে একটি কাঁঠাল গাছ হইয়াছিল। চোরে তাঁহার কাঁঠাল চুরি করিতে গিয়া সমস্ত রাত্রি কাঁঠাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

তিনি একজনকে পুষ্করিণীতে একবার জাল ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন, সে দ্বিতীয়বার জাল ফেলিয়া সমস্ত রাত্রি তথায় দাঁড়ইয়াছিল। ইনি মিঞা ছাহেব নামে পরিচিত ছিলেন, বগ্দাদ হইতে হজরত মিরান শাহ ছাহেবের সহচর রূপে এখানে আসিয়াছিলেন, এই হরিচ্চর কাঞ্চনপুরের নিকটস্থ গ্রাম। তিনি বসিয়া তছবিহ পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় উই পোকা মাটী তুলিয়া তাঁহার কবর বানাইয়া দিয়াছিল, এই অবস্থাতে তাঁহার এন্তেকাল হইয়া যায়। তিনি ফিরোজ শাহের রাজত্ব কালে নওয়াখালিতে

আগমন করিয়াছিলেন।

(৩) নওয়াখালী টাউনের পশ্চিমে মাওলানা ইয়াকুব নুরীর মজার আছে। তথায় মৌলবী ইয়াকুব নামে দ্বিতীয় একজন লোক ছিলেন। কোন লোক দ্বিতীয় মৌলবী ইয়াকুব ছাহেবের নামে কতকগুলি টাকা মনিঅর্ডার করিয়াছিল, কিন্তু পিওন ভ্রমবশতঃ মাওলানা ইয়াকুব নুরিকে সেই টাকাগুলি দিয়াছিল। তিনি উক্ত টাকাগুলি লইয়া দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিয়াছিলেন। মৌলবী ইয়াকুব ছাহেব দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ অবগত হইয়া উক্ত মাওলানা ছাহেবের নামে কোর্টে মকাদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন।

কোর্টের তলবে মাওলানা নুরী ছাহেব খড়ম পায় দিয়া কোর্টে উপস্থিত হন। ডেপুটী ঝাড়ু মিঞা ওরফে সেকেন্দার মিঞা খড়ম দেখিয়া বলেন, খড়ম পায়ে দিয়া কোর্টে আসাতে কোর্টের অবমাননা হইয়াছে, মাওলানা নুরী ইহার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। ইহাতে ডেপুটী ছাহেব এই কোর্ট অবমাননার জন্য তাঁহার উপর ৫০ টাকা জরিমানার আদেশ দেন। নওয়াখালী টাউনের মুছলমানেরা তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন, এই হেতু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা কোর্টে দাখিল করিয়া দেন। তৎপরে অন্য কোন কথার জন্য দ্বিতীয়বার তাঁহার উপর দ্বিতীয় জরিমানার আদেশ দেন। মাওলানা বলিলেন, এই বেটা কি পাগল হইয়াছে, আমাকে যে মকদ্দমার জন্য তলব দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল জরিমানাই করিতেছে, এই কথা বলা মাত্র ডেপুটী ছাহেব পাগল অবস্থায় কোর্ট হইতে বাহির হইয়া যান। বহু দিবস তিনি পাগল অবস্থায় ছিলেন।

(৪) নওয়াখালী টাউনের মাওলানা আবদুল্লাহ ছাহেবের মাজার আছে। ইনি কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন দরবেশ ও ছা'দুল্লাপুরের মাওলানা এমামদ্দিন ছাবেবর খলিফা ছিলেন। এক সময় মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী ওয়াজ করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে

একজন লোক ওয়াজ শুনিতেছিল, মাওলানা লোকদিগকে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, অথচ সেই লোকটির চলিয়া যাওয়া নিতান্ত দরকার ছিল। মাওলানা আবদুল্লাহ কাশ্‌ফ দ্বারা তাঁহার চলিয়া যাওয়ার আবশ্যকতা বুঝিয়া বলিয়া ফেলিলেন, হাফেজ ছাহেব, এই লোকটিকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিন। হাফেজ ছাহেব বলিলেন, সভাস্থলে এইরূপ কথা প্রকাশ করা ঠিক নহে।

নওয়াখালী শোজাপুরের মৌলবী করিম বখ্‌শ ছাহেব বলিয়াছেন, তিনি প্রায় মজযুব অবস্থায় থাকিতেন, তিনি মাইজদিয়া গ্রামে আশ্বিন মাসে কাঁঠাল খাইতে চাহি বলিয়া এক পতিত বাড়ীর কাঁঠাল গাছ অনুসন্ধান করিতে বলেন, সেই সময় উক্ত গাছে একটা কাঁঠাল পাওয়া গিয়াছিল।

(৫) নওয়াখলীর বজরা ষ্টেশনের নিকট এক বোজর্গের গোর আছে, বাদশাহ শাহ জাহানের আমলে এক বিধবার দুইটী পুত্র শাহ আমানুল্লাহ খাঁ ও শাহ ছানাউল্লাহ খাঁ ছাহেবদ্বয়কে উক্ত বাদশার পক্ষ হইতে কিছু পরিমাণ নিষ্কর জাএদাদ প্রদান করা হইয়াছিল। তাহাদের এক ভাই নিঃসন্তান ছিল, অন্য ভাইয়ের একটী কন্যা সন্তান ছিল, একজন একটী মছজেদ প্রস্তুত করিয়া দেয়, অন্যে একটী দীঘি কাটিয়া দেয়, দীঘি খনন করা কালে একদিকে একটী লাশের উপর কোদালের আঘাতে তাজা রক্ত বাহির হয়। তিনি স্বপ্নে বলেন, আর যেন, সেইদিকে খনন করা না হয়। সেই কবরের কারামত এই যে, যখন দীঘির পানি বেশী হয়, তখন কবর উচ্চ হইয়া যায়, আর যখন পানি নীচে নামিয়া যায়, গোরটী নীচে নামিয়া যায়।

(৬) নওয়াখালী জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ থানার এলাকায় কচুয়ার নিকট তালতলা ত্রিমোহনীতে একজন দরবেশের গোর আছে।

(৭) নওয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চৌমহানি

ষ্টেশনের ২ মাইল পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামে একটি কবরস্থান আছে, এক সময় একজন হিন্দু জমিদার তথায় হস্তী ছাড়িয়া দিয়াছিলে, লোকেরা তাহাকে সেই কবরস্থানে হস্তী ছাড়িয়া দিতে নিষেধ করেন, ইহাতে জমিদার বিদ্রুপ করেন। তিনি কাছারিতে গেলে, হস্তী মরিয়া পড়িয়া থাকে, সেই হইতে লোকেরা বুঝিতে পারেন, তথায় একজন বোজর্গের মজার শরিফ রহিয়াছে, কিন্তু কেহ উক্ত গোরটি সঠিক ভাবে শনাক্ত করিতে পারেন না।

(৮) নাথের পেটুয়ার ৩ মাইল পূর্ব্ব দিকে পদুয়া গ্রামে কারি অবদুর রহিম খাঁ লাহুরী ছাহেবের মজার আছে। তিনি একখানা কম্বল লইয়া পথে, ময়দানে যে সে স্থানে শয়ন করিয়া থাকিতেন।

(৯) নওয়াখালীর রায়পুরা গ্রামে মাওলানা ফজলুল্লাহ ছাহেবের মজার শরিফ আছে। ইনি প্রথমে হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের খলিফা ছিলেন। তিনি নিজের পুত্র ফজলোল হক ছাহেবকে রাখালিয়া গ্রামের কেয়ামদ্দিন পাটারীর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মাওলানার পুত্রবধু পিত্রালয়ে গেলে, তাহার পিতা বলিলেন, তোমার শ্বশুর কি ভাবে হাটিয়া থাকেন? কন্যাটি শ্বশুড় যেরূপ খোড়াইতে খোড়াইতে চলিয়া থাকেন, অবিকল সেই খঞ্জভাব দেখাইয়া দিল, অমনি তাহার পা খঞ্জ হইয়া গেল।

এক সময়ে তিনি কোর্দ্দীর আজমত মোল্লার বাটিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, আমাদের বাটিতে একটা জটাবিশিষ্ট তাল গাছ হইয়াছে, ইহার কি প্রতিকার করিব? তিনি উক্ত বৃক্ষের তিন দিক্ স্পর্শ করিয়া দোয়া করিয়াছিলেন, সেই তিন দিকে তাল হইয়া থাকে, আর যে দিক্‌টা স্পর্শ করেন নাই, সেইদিকে তাল হয় না।

মাওলানা ফজলুল্লাহ ছাহেব প্রথমে স্বন্দিপে থাকিতেন, তৎপরে তিনি তথা হইতে নওয়াখালীর বামনি গ্রামে বাসস্থান স্থির করেন,

তথায় তাঁহার উপর অত্যাচার হইতে থাকে, এই হেতু রায়পুরার ইউছুফ মুন্‌শী নিজের জমি হইতে বলরাম নাপিতকে উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সেই বাটিতে স্থান দেন।

এক সময় মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের বদনা পায়খানায় পড়িয়া গিয়াছিল, মাওলানা ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে মৌলবী ফজলুল্লাহ ছাহেব পানির মধ্যে গিয়া বিষ্ঠারাশির মধ্য হইতে বদনাটি লইয়া পরিষ্কার করিয়া গোছল করিয়া তাঁহার খেদমতে বদনাটি হাজির করিলেন। ইহাতে তিনি সকলকে হাত উঠাইতে বলিলেন, তিনি হাত তুলিয়া তাঁহার উন্নতির জন্য দোয়া করিলেন।

নইমদ্দিন হাওলাদার মৌলবী ফজলুল্লাহ ছাহেবের নিকট দিয়া কোন দাওতে যাইতেছিল, কিন্তু ছাতি আড়াল করিয়া যাইতেছিল, ইহাতে মৌলবী ছাহেব বলিলেন, আমি নেংড়া মানুষ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া যাইতেছ? ইহাতে হাওলাদার ছাহেব কানা হইয়া যান।

শাহচার মৌলবী করিম বখ্‌শ ছাহেব নূতন পড়িয়া আসিয়া তাঁহার সহিত বে-আদবি করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি কি পাগল হইয়াছ? সেই হইতে মৌলবী করিম বখ্‌শ ছাহেব মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় আছেন।

চাঁদ মিঞা পাটারি আরে আরে নারে নারে বলিয়া গান করিতেছিল, মৌলবী ফজলুল্লাহ ছাহেব একটু অগ্রে গিয়া বলিলেন, আমি খোঁড়া মানুষ আমাকে অগ্রগামি হইতে ডাকিতেছ, আমি খোঁড়া মানুষ কিরূপে অগ্রগামি হইব? ইহাতে পাটারি ছাহেবের গলা ফুলিয়া পচিয়া যায়, এই ব্যাধিতে সে মরিয়া যায়।

তাঁহার গোরের নিকট দিয়া কেহ পাল্‌কীতে বা ঘোড়ার উপর যাইতে পারে না। মাওলানা হাফেজ আহমদ ছাহেবের

ভাগ্নিনেয় মাওলানা মহফুজোল হক ছাহেব তাঁহার গোরের নিকট হইতে পাল্‌কীতে যাইতেছিলেন, অমনি পাল্‌কী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেলেন।

দক্ষিণ রায়পুরের রওশন ব্যাপারী উক্ত পীর ছাহেবকে বালামচরের হামিদুল্লাহ ভূঞার বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে লইয়া গিয়াছিল, তথাকার ছেলেরা তাঁহাকে ঢিল মারিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, হামিদুল্লাহ ভূঞা শুকাইয়া যাউক, রওশন আমাকে জ্বালাইয়াছে—জ্বলিয়া যাউক, অমনি রওশনের বাটী জ্বলিয়া যায় এবং ভূঞা শুকাইতে শুকাইতে মরিয়া যায়।

মাওলানা আরেফ পেশাওয়ারি ছাহেব ঢাকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি রায়পুরাতে মৌলবী ফজলুল্লাহ ছাহেবের কবরে নীহারের ন্যায় নুর নাজিল হইতে দেখিয়াছি।

(১০) নওয়াখালী সদরের ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে পদুয়া গ্রামে একজন বোজর্গের মজার আছে।

(১১) উক্ত টাউনের ৮ মাইল পূর্ব্বদিকে গুল্লাখালি গ্রামে ছুফি আলিমদ্দিন মরহুম ছাহেবের মজার আছে, ইনি মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের খলিফা ছিলেন, তিনি ১২ বৎসর যাবৎ ছোন ভিটায় মোরাকাবা করিতেন, উক্ত ভিটা বর্ষাতে ভিজিত না। এক সময় আছরে তাঁহার বাটীতে কোন অতিথি আসিয়াছিল, খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, তাঁহার নিকট এই সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তিনি উড্ডীয়মান দুইটা পক্ষীকে নামিয়া আসিতে বলেন, পক্ষীদ্বয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি উভয়টি জবহ করিয়া মেহমানের সেবা করিতে আদেশ দেন।

উক্ত গ্রামের মৌলবী আবদুল করিম ছাহেবরে মজার আছে। ইনি মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের খলিফা ও বড় বোজর্গ ছিলেন।

(১২) বজরা ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে অম্বর নগর গ্রামে মৌলবী অলিউল্লাহ্ নামক একজন বোজর্গের মাজার আছে। ইনি মাওলানা আবদুল হক মোহাজেরে-মক্কি ছাহেবের খলিফা ছিলেন।

(১৩) মাইজদি ষ্টেশনের ৩ মাইল পশ্চিম দিকে দিলিলপুর প্রকাশ্য টাঙ্গিরপাড় গ্রামে বাদশাহ্ মিঞার মজার আছে। ইনি বাঘের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্বকোণে একটা কাঁঠাল গাছ আছে, উহাতে বহু কাঁঠাল হইত। একজন পথিক একটি পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণ পাইয়া রাত্রিতে উহা পাড়িয়া লইবার জন্য গাছে উঠিয়া সমস্ত রাত্রি কাঁঠাল ধরা অবস্থাতে দাঁড়াইয়া থাকে। পীর ছাহেব ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। প্রায় ৬০/৭০ বৎসর হইল তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।

(১৪) নওয়াখালী টাউনের ৮ মাইল পূর্ব্ব দিকে ভাটুইয়া গ্রামে মাওলানা নরুদ্দিন ছাহেবের মজার আছে, ইনি শাজেলিয়া তরিকার খলিফা ছিলেন। তাঁহার বাটীর লোকেরা তাঁহার বিনা আদেশে মৎস্য খরিদ করিয়া খাইয়াছিলেন, যখন তিনি বাটী আসিয়াছিলেন, একটা মৎস্যের পোটলা তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল, তিনি বলিলেন, শোজা নামক জ্বেন বাটীর সংবাদ অবগত করান উদ্দেশ্যে ইহা নিক্ষেপ করিয়াছে। কালা মিঞা নামক একটি লোক মোকদ্দমায় কারারুদ্ধ হওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামের এক বোজর্গের নিকট দোয়ার জন্য যায়, তিনি বলেন, তোমার দেশে মাওলানা নুরদ্দিন নামক একজন পীর আছেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দোয়া লইলে, তুমি নিষ্কৃতি পাইবে। সে তাহাই করিলে, নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

(১৫) নওয়াখালী টাউনের ৮ মাইল পূর্ব্ব দিকে মনি নগরে মৌলবী হবিবুল্লাহ ছাহেবের মজার আছে, ইনি শাজেলিয়া তরিকাতে

মাওলানা নুরদ্দিন ছাহেবেরে খলিফা ছিলেন। তিনি কোন মকদ্দমা রুজু করায় উকিলেরা বলেন, দুইটা মিথ্যা কথা না বলিলে, আপনার মোকদ্দমা নষ্ট হইবে। তিনি বলেন, আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না। মোকদ্দমা কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি সোমবার হালকা করিয়া খোদার নিকট দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ, আমায় যেন মিথ্যা কথা বলিতে না হয়। বুধবার তাঁহার এন্তেকাল হইয়া যায়।

(১৬) ফেনি ষ্টেশনের ১৫ মাইল দক্ষিণে নলদিয়া গ্রামে দেওয়ান শাহের দরগা আছে, ইনি বড় বোজর্গ ছিলেন।

(১৭) চৌমহানি ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্ব দিকে কোতাবপুর গ্রামে শাহ মোহম্মদ ইউছফ ছাহেবের মজার আছে। যে ব্যক্তি যে কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, খোদা তাহার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিতেন। ১২৮৩ সালের প্লাবনের পূর্ব্ব দিবস তিনি বৃক্ষের উপর মৎস্য ধরা দাড় (ঘুনি) টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন, খোদা তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে এই প্লাবনের সংবাদ অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন। কোন গ্রামে কলেরা উপস্থিত হইলে, তিনি তথায় গেলে, আর পীড়া থাকিত না।

কোন লোক মরিবার পূর্ব্ব দিবসে তিনি উক্ত ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া লাশের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, ইহাতে তাহারা বুঝিত তাহাদের কেহ মরিয়া যাইবে।

(১৮) ফেনি ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোনে বশুরহাট বাজারে লালুর বাপ মিঞার মজার আছে, ইনি মজযুব ফকির ছিলেন লোকেরা একই দিবসে একই সময়ে বিভিন্ন হাটবাজারে তাঁহাকে দেখিতে পাইত।

(১৯) ফেনিতে পাগলা মিঞার দরগা আছে, ইনি মজযুব ফকির ছিলেন। বাসবেড়িয়ার হিন্দু জমিদার বাণিজ্যে জহাজখানা সমুদ্রে ঝড় পড়িয়া নিমজ্জিত প্রায় হইয়াছিল, এমন সময় জাহাজের

লোকেরা বলিয়াছিল, যদি খোদা জাহাজখানা উদ্ধার করেন, তবে আমরা পাগলা শাহের মৃত্যুর পরে তাহার গোর পোক্তা করিয়া দিব। ঠিক সেই সময় হজরত পাগলা শাহ একটি বৃক্ষে মজবুত রজ্জু বাঁধিয়া লোকদিগকে সজোরে টানিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। লোকে এই ব্যাপারে অবাক্ হইতেছিল, জাহাজিরা দেশে আসিয়া জাহাজখানার আশ্চর্য্যরূপে নিরাপদে থাকার সংবাদ প্রকাশ করে। কিছু দিবস পরে পাগলা শাহ এন্তেকাল করিলে, জমিদারেরা তাহার গোর পোক্তা করিয়া দেন।

ফেনির ৭ মাইল পূর্ব্ব দিকে পানুয়া গ্রামের মুনশী আবদুছ ছামাদ ছাহেব নিজের পিতা নাজির মোহম্মদ রাজা মিঞার কঠিন পীড়া আরোগ্য হওয়ার জন্য দোয়া চাহিতে গিয়াছিলেন। শাহ ছাহেব চাদর উড়িয়া শয়ন করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি জযবায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন, নয়—ছয় পনর, নয়—ছয় পনর। তৎপরে তাহারা বাটীতে ফিরিয়া গেলেন, ১৫ দিবসের মধ্যে নাজির ছাহেবের মৃত্যু হয়। ১২৮৩ সালের বন্যার এক দিবস পূর্ব্বে তিনি বৃক্ষের উপর মৎস্য ধরা দাঁড় (যন্ত্র) বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সমস্ত শহর প্লাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মজারে পানি উঠে নাই।

(২০) শয্যদিয়া ষ্টেশনের ৩ মাইল পুর্ব্ব উত্তর দিকে কাছাড়ের জঙ্গলে ফাজেল মোহম্মদ চৌধুরী ছাহেবের মজার আছে, প্রথমে তাঁহাকে চরে গোর দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মাটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহার পায়ের কতকাংশ বাহির হইয়া গিয়াছিল, তিনি স্বপ্নযোগে নিজের আত্মীয়গণকে বলেন, আমি বেএজ্জত হইতেছি, তোমরা আমাকে অন্য স্থানে লইয়া গোর দাও, পরে তাঁহাকে কাছাড়ের বনে দফন করা হয়।

(২১) শয্যদিয়া দীঘির পাড়ে কল্লাহ শহীদের গোর আছে, কল্লাটী দিঘীর মধ্যে ছিল, একজন লোক জাল ফেলিয়াছিল, জালে কল্লা উঠিয়া পড়ে, কল্লা কলেমা পড়িয়া বলিতে থাকে, আমাকে

দীঘির পাড়ে দফন কর। কোন কাফের কর্ত্তৃক সেই বোজর্গ শহিদ হইয়া যান।

(২২) ফেনির ৭ মাইল পূর্ব্ব দিকে পানুয়া গ্রামে মোহম্মদ হানিফ নামে এক বোজর্গের মাজার আছে, জুমা রাত্রে উক্ত কবর হইতে সুবাস বাহির হইয়া থাকে।

(২৩) চৌমহানি ষ্টেশনের ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে মির আহমদপুর গ্রামে হামিদুল্লাহ খোন্দকার ছাহেবের মাজার আছে, ইনি মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেবের মুরিদ ছিলেন। তাঁহার কারামত এই ছিল যে, পুষ্করিণীতে কাহারও কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ও বহু অনুসন্ধানে পাওয়া না গেলে, তিনি বিছমিল্লাহ বলিয়া হাত দিলে, উক্ত বস্তু তাঁহার হাতে আসিয়া যাইত, ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। তিনি চোর ধরার আশ্চর্য্যজনক রুটিপড়া জানিতেন। তিনি ১৩৩৯ সনের ২২শে মাঘ এন্তেকাল করিয়াছেন।

(২৪) সেনবাগ থানার অধীন সায়েস্তা নগর গ্রামে হজরত ফয়েজুল্লাহ শাহ সাহেবের মাজার আছে। তথায় একটি পুষ্করিণী আছে। কোন ব্যক্তি জেয়ফত উপলক্ষে আবশ্যক মত বরতন, গেলাস, পিয়ালা ইত্যাদির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া ফরমাএশ দিলে, নৌকাযোগে কিনারায় পৌঁছিয়া যাইত, জেয়াফত শেষ হইলে, পরিষ্কার করিয়া কিনারায় রাখিয়া যাইতে হইত। একবার কোন দুষ্ট লোক জেয়াফত অন্তে একটা জিনিষ রাখিয়া দিয়াছিল, সেই সময় হইতে উক্ত জিনিষ পত্র আসা বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজি ১৯২০ সালে জরিফ করা উপলক্ষে ঐ দরগা জরিফ করিতে গিয়া একজন কানুনগো, একজন আমিন ও একজন নলি মারা যায়। তৎপরে আর উহা জরিফ করা হয় নাই। কেহ তথাকার পুষকরিণীর মৎস্য ধরিতে গেলে অথবা তথাকার তাল ও অশ্বত্থ গাছের ডাল পাতা ভাঙ্গিয়া লইলে, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ভলুয়ার জমিদারগণ তাঁহার ওয়ারেছগণকে সাড়ে সাত কানি জমি লাখেরাজ দান করিয়াছেন।

(২৫) গাইয়ারচর নিবাসি মুনশী মোহম্মদ ছিদ্দিক ছাহেব বলিয়াছেন, নওয়াখালী জেলার লক্ষীপুরা থানার ৪ মাইল পশ্চিম উত্তরে বালামচরে ছুফি বাহাউদ্দিন ছাহেবের মজার আছে, দুই বৎসর পরে নদী সেকাস্তির জন্য তাঁহার গোটালাশ অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে লোকে দালাল বাজারের দক্ষিণে ছকিনা বিবির বাড়ীতে তাঁহাকে দফন করেন। লোকেরা তাঁহার এন্তেকালের পরে তাঁহাকে সুন্দরবনে খড়ম পায়ে দিয়া চলিতে দেখে, ইহাতে তিনি বলেন, তোমরা দেশে গিয়া আমার এই সংবাদ প্রকাশ করিও না। ইনি হজরত ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের মুরিদ ছিলেন, প্রায় ১০/১২ বৎসর এন্তেকাল করিয়াছেন।

(২৬) নওয়াখালী চরহাজারি গ্রামে মাওলানা আবদুল আজিজ ছাহেবের মাজার আছে, ইনি জীবিতাবস্থায় গোরের ভিতর থাকিয়া চেল্লা করিয়াছিলেন, মস্ত তেজ ফয়েজের অলি ছিলেন, ইনি কলিকাতার মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন ছাহেবের খলিফা ছিলেন।

(২৭) লক্ষীপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে ও দালাল বাজারের অর্দ্ধ মাইল দুরে নেংটা মিয়ার দরগা আছে, ইনি মজযুব ফকির ছিলেন।

(২৮) সন্দীপে মাওলানা রমিজদ্দিন সাহেবের মাজার আছে, ইনি মাওলানা এমামদ্দিন ছাদুল্লাহপুরী ছাহেবের খলিফা ছিলেন, মস্ত অলী ছিলেন, এই হজরতের সমস্ত জীবনী এখনও অবগত হইতে পারি নাই।

ইনি ২২ বার হজ্জ করিয়াছিলেন, তিনি হজ্জে যাওয়ার পূর্ব্বের কিছুই আলোচনা করিতেন না। যখন তিনি বাম হাতে গাঠরি লইতেন, তখন লোকে বুঝিতে পারিত যে, তিনি হজ্জে যাইবেন, দেখিতে দেখিতে লোকেরা ২/৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

(২৯) উত্তর হাতিয়াতে ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকট শাহ সুফি

মুনশী মুজিবর রহমান ছাহেবের মাজার আছে, ইনি মাওলানা ছুফি আহমদুল্লাহ ইছাপুরী ছাহেবের মুরিদ ছিলেন। ৩ বৎসর হইল, তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।

(৩০) নওয়াখালী জেলার রামগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপুর গ্রামে খোন্দকারের দিঘীর উত্তর পাড়ে এক বোজর্গের মাজার আছে, তাঁহার জন্য অধকানি লাখেরাজ জমি দান করা রহিয়াছে। ইহা উক্ত গ্রামের অবদুছ ছোবহান মিঞার বর্ণনা।

হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব

নওয়াখালী বশিকপুর নিবাসী মুনশী মোহম্মদ অলিউল্লাহ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

(৩১) এই হজরত জনাব মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ ছাহেবের প্রধান খলিফা ছিলেন, তিনি ২৫ বৎসর হজরত সৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে থাকিয়া তরিকত তত্ত্বে কামেল ও মোকাম্বেল হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্গে জেহাদে গমন করিয়া গাজি হইয়াছিলেন, ইনিই প্রথমে নওয়াখালীতে শরিয়ত ও তরিকত প্রচার করেন। তিনি ১২৪০ সনে নওয়াখালী হেদাএত করিতে আরম্ভ করেন, ঢাকা আজিমপুর দাএরার শাখা স্বরূপ নওয়াখালীতে তিনটি দাএরা স্থাপিত হয়, লক্ষীপুরাতে হজরত আজিম শাহ ছাহেব কর্ত্তৃক, উত্তর হাতিয়াতে হজরত চাঁদ শাহ ছাহেব কর্ত্তৃক ও শামপুরের হজরত শাহ জকিউদ্দিন সাহেব কর্ত্তৃক এই তিনটী দাএরা স্থাপিত হয়। লক্ষীপুরে জঙ্গল ছিল, তথায় বাঘ ও শূকরের ভয় ছিল, শাহ আজিম সাহেব জঙ্গলে খালের ধারে হোজারাতে এবাদত বন্দিগি করিতেন। সেই সময় সপ্তাহের মধ্যে এক দুইবার খিচুড়ি প্রস্তুত করার জন্য খাদ্য সামগ্রী খরিদ করিতে তাহার খাদেম হাট বাজারে যাইত, ইহাতে ক্রমন্বয় তাহার আলোচনা চারিদিকে ছড়াইতে থাকে, অবশেষে

লোকেরা জানিতে পারিয়া প্রায় দাএরাতে খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিত। তৎপরে বশিকপুরে জনাব মাওলানা মোহাঃ হাফিজুল্লাহ ছাহেবের দাদা মুনশী মইনদ্দিন ছাহেব ও তাঁহার মামুনুর আহমদ ছাহেব সপ্তাহে একবার উক্ত দাএরাতে উপস্থিত হইয়া জনাব আজিমশাহ ছাহেবের নিকট এলম শিক্ষা করিতেন। জনাব মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের বাটী নওয়াখালীর ছাদুল্লাহপুরে ছিল, এক দিবস তিনি রাত্রে লক্ষীপুরের মছজেদে উপস্থিত হন, শাহ ছাহেব তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি বলেন, আমার খাদ্য আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইব, আপনার কষ্ট স্বীকার করার আবশ্যক নাই। শাহ সাহেব মনে মনে বলিলেন, যে লোকটী নিজের খাদ্য নিজে খাইলেন, তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা জরুরী।

শাহ ছাহেব তরিকতের প্রত্যেক মকাম ও দাএরা সম্বন্ধে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎসমস্ত এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, তিনি একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। তৎপরে মাওলানা ছাহেব আর তথায় কাল বিলম্ব না করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান। এক দিবস তিনি উক্ত মুনশী মইনদ্দিন ও নুর আহমদ মিএগ সাহেবদ্বয়কে বলিলেন, ছাদুল্লাহপুরের একজন মাওলানা যাহার নাম হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব, তিনি এত বড় মাওলানা ও দরবেশ যে, তাঁহার তুল্য কোন মাওলানাকে আমি দেখি নাই। ইহারা তাঁহার মুখে উক্ত মাওলানা ছাহেবের গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার সাক্ষাতের জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন। ঐ ছা'দুল্লাহপুরের বাদুল্লাহ ব্যাপারী নৌকা যোগে বশিকপুর অঞ্চলে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তাঁহার নৌকায় আরোহন করিয়া উক্ত মাওলানা ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন এই নৌকা খানা ভাল নহে। দ্বিতীয় বারে ভাল নৌকাতে যাইবেন। দ্বিতীয় বারে তাঁহারা

৫/৭ জন ছাদুল্লাহপুরে পৌঁছিয়া তাঁহাকে বশিকপুরে শুভাগমন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বশিকপুরে খোন্দকার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে মুরিদ করিয়া শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করেন। তিনি তথায় পদাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, এই স্থানটী ঈদ্‌গাহ্ হইল। তাঁহার বড় কারামত এই যে, যে সময় বন্যাতে সমস্ত দেশ, লক্ষীপুর পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই ঈদ্‌গাহটী ডুবে নাই। সেই সময়ের লোকেরা বশিকপুর বাসিদিগকে ২৭ সনের মুরিদ বলিয়া দোষারোপ করিত। বশিকপুরে ছায়াবানু নামক একটী স্ত্রীলোক জমিদার ছিলেন, তিনি উক্ত হজরতের নিকট মুরিদ হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার গোমাস্তাগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিলেন, ইহাতে জমিদারনি ছাহেবা বলিলেন, যদি তোমারা তাঁহাকে আনিয়া না দাও, তবে তোমাদের চাকুরি বরখাস্ত করিয়া দিব। কর্ম্মচারিগণ কমিটির পরে বলিলেন, আপনি একা মুরিদ হইবেন কেন? আমাদিগকে লইয়া এক সঙ্গে মুরিদ হইবেন এবং সমস্ত লোককে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিবি সাহেবানি ৫০/৬০টি গরু জবহ করিয়া বিরাট জেয়াফতের ব্যবস্থা করিলেন ও বহু সহস্র লোককে সংগ্রহ করিয়া হজরত মাওলানার নিকট মুরিদ করাইয়া লইলেন এবং নিজেও মুরিদ হইলেন। কালে কালে ন্যায়পরায়ণ লোকদিগের বিরুদ্ধে হিংসুকদিগের দল দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, মাওলানা ছাহেবের ক্রমোন্নতি দেখিয়া হিংসুকেরা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিলেন, এই মাওলানা গোটা নওয়াখালীর পীর হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, হয়ত তিনি অচিরে রাজ বিদ্রোহিতা করিতে পারেন, আপনারা ইহার প্রতিকার করুন। ম্যাজিষ্টেট বাহাদুর তাঁহাকে তলব দিয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি খোদার কালাম কোরান অনুসারে লোকদিগকে নামাজ, রোজা, হজ্জ জাকাত করিতে বলি, কলহ ফাছাদ চুরি ডাকাতি জুলুম অত্যাচার ও অন্যান্য অহিত

কার্য্য করিতে নিষেধ করি। তৎশ্রবণে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলিলেন, ইহাতে আমাদের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, আচ্ছা, আপনি ভালরূপে প্রচার করুন, দরকার হইলে পুলিশের সাহায্য পাইতে পারিবেন। হিংসুকেরা তিরষ্কৃত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত অবস্থায় প্রস্থান করিলেন। সেই হইতে মাওলানা দ্বিগুণ বেগে নওয়াখালী হেদাএত করিতে লাগিলেন। হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব আজিম শাহ সাহেবেরে এক কন্যার সহিত বিবাহ করেন, সেই পক্ষ হইতে হজরত মাওলানা হামেদ ছাহেব পয়দা হইয়াছিলেন। মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব হাতিয়া দাএরার চাঁদশাহ সাহেবের কন্যার সহিত বিবাহ করেন, মাওলানা সাত দিবস পর্য্যন্ত শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন, সেই সময় দাএরাতে রন্ধন করা হইত না। সেই ৭ দিবস প্রত্যহ চারিদিক্ হইতে পোলাও কোর্ম্মা ইত্যাদি ২/৩ শত লোকের খাদ্য সামগ্রী আসিত, চাঁদশাহ সাহেব দাএরাতে জেকের করা কালে তাম্বুরা বাজাইতেন, মাওলানা নিজের বিবিকে লইয়া যাওয়া কালে শাহ সাহেব বলিলেন, আমি একটী মূল্যবান জিনিষ আপনাকে যৌতুক স্বরূপ দিতে চাহি। তদুত্তরে মাওলানা বলিলেন, আমি অপনার তাম্বুরাটী চাহিতেছি। তিনি অগত্যা তাহাই দিতে স্বীকার করিলেন, নৌকার মধ্যে তিনি পদাঘাত করিয়া তাম্বুরাটী ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে শাহ সাহেবের কন্যা বলিলেন, আমার ওয়ালেদ সাহেব যে জিনিষটা আদর করিয়া মস্তক ও স্কন্ধ দেশে রাখিতেন, আপনি তাহা এইরূপ ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, ইহা কি সভ্যতার পরিচায়ক? তিনি বলিলেন, চুপ, বিবি সাহেবানি নওয়াখালী না পৌছান পর্য্যন্ত বাকশক্তিহীন অবস্থায় রহিয়া গেলেন এবং এই এক কথাতেই কামেল হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমি পিত্রালয়ে গেলে, বাদ্য রহিত করার চেষ্টা করিব, তিনি হাতিয়াতে গিয়া তহাই করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বেদায়ত তথায় অনুষ্ঠিত হয় না। যখন হজরত

সৈয়দ আহমদ ছাহেব জেহাদে যাইতেছিলেন, তখন মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব বলিয়াছিলেন, তরিকত শেষ করিতে আমার কিছু বাকি থাকিল, আমি কি করিব। তিনি বলিলেন, ছেরাতন মোস্তাকিম শিক্ষা করিবা। তিনি বলিলেন, কাহার নিকট হইতে উহা বুঝিয়া লইব। হজরত বলিলেন, নওয়াখালীর ছাদুল্লাহপুরের মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব এই কেতাবের সম্পূর্ণ মর্ম্ম আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। এই হেতু মাওলানা কারামত আলি ছাহেব তাঁহার নিকট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতে আসেন। যখন মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব হজ্জে যান, তখন তিনি মাওলানা কারামত আলি ছাহেবকে অছিয়ত করিয়া যান, আপনি আমার মুরিদগণের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তরিকত তত্ত্ব যত শিক্ষা দিতে পারুন, না পারুন, কেতাব লিখিয়া বেদাত মতগুলি খণ্ডন করিবেন, এইহেতু মাওলানা কারামত আলি ছাহেব বেশী সময় কেতাব লিখিতে ব্যয় করিয়াছিলেন। হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব হজ্জে রওয়ানা হইয়া গেলেন, হজ্জ হইতে ফেরত কালে ষ্টীমারে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এক রাত্রে সন্ধ্যাকালে তিনি মুরিদগণকে বলিয়াছিলেন, যদি এই রাত্রে একজন লোক মরিয়া যান, তবে তোমরা কি করিবা ? তাহারা বলিলেন, হুজুর আপনি বলুন। তিনি বলিলেন, কাফন দিয়া তক্তার উপর রাখিয়া পাথর বাঁধিয়া ডুবাইয়া দিবে। সেই রাত্রেই উক্ত মাওলানা এন্তেকাল করেন। তাহার অছিয়ত অনুসারে তাঁহাকে তক্তায় করিয়া ডুবিয়া দেওয়া হয়, সেই স্থানে চর হইয়া যায়, সেই চরটীকে এমামের চর বলা হইত।

হাফেজ মোহম্মদ হাতেম ছাহেব রায়পুরা বড় মছজেদে ওয়াজ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যখন রাত্রি কালে তাঁহাকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তখন সমুদ্র আলোকিত হইয়া যায়, পার্শ্ববর্ত্তী নৌকার লোকেরা, ষ্টীমারের লোকেরা ইহাতে অবাক হইয়া যায়, অবশেষে তাহারা জানিতে পারিলেন, নওয়াখালীর একজন বোজর্গ

এন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহাকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই হেতু এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। নওয়াখালীর বশিকপুরের মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, আমি আমার খালুর মুখে শুনিয়াছি, জনাব মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব জ্বেনের বাদশার একটী পুত্রকে পড়াইতেন, সেই ছাত্রটী পৃথক এক ঘরে থাকিত, অন্য কাহাকেও সেই ঘরে থাকিতে দিত না, হজরত মাওলানা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া ধারণা করিতেন, এক দিন প্রভাতে হজরত মাওলানা ফজর পড়ার জন্য সেই ছাত্রটীকে জাগাইবার জন্য তাহার কামরাতে প্রবেশ করিয়া একটী বিকট মুর্ত্তিধারী জীবকে শায়িত দেখিয়া ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে ছাত্রটীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, আমি জ্বেন বাদশার পুত্র, এলম শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমরা অন্য সময় সকল প্রকার আকৃতি ধারণ করিতে পারি, কিন্তু শয়ন কালে নিজের আসল আকৃতি ধারণ না করিলে, আমাদের নিদ্রা আসে না। সেই ছাত্রটী শিক্ষা শেষ করিয়া বলিল। হুজুর, আমার পিতা বাদশাহ ও দেশীয় অন্যান্য লোকেরা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার আকুল আকাঙ্খা রাখেন, আপনি একবার আমাদের দেশে চলুন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তোমাদের আকৃতি পৃথক, আমাদের আকৃতি পৃথক, কাজেই তোমাদের দেশে গেলে কি লাভ হইবে? ছাত্রটী বলিল, তাহারা মনুষ্য আকৃতিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। হজরত মাওলানা বলিলেন, কিরূপে তোমাদের দেশে যাইব? সে বলিল, আপনি পাল্‌কীর মধ্যে থাকিবেন, আমরা লইয়া যাইব। তৎপরে পাল্‌কীতে বসিলেন, পাল্‌কী শূন্যমার্গে উড়িয়া এক স্থানে উপস্থিত হইল, তিনি তথায় বহু সহস্র লোকের বিরাট সভা দেখিলেন, বাদশার সম্মুখে তাঁহার উচ্চ আসন দেওয়া হইল, বাদশাহ ও তাহার দরবারের উজির নাজির ও আলেমগণ তাঁহার যথাবিহিত সম্মান করিলেন। সেই সময় একটী লাশ নীত হইল, বাদী ও প্রতিবাদী উপস্থিত ছিল। হজরত মাওলানা এই ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, এই বাদশার অন্য পুত্র

সর্পের আকৃতি ধরিয়া এক মছজেদের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল, তথাকার মোয়াজ্জেন সেই সর্পটাকে মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। লাশটী জ্বেন বাদশার পুত্র, প্রতিবাদী সেই মোয়াজ্জেন, তাহাকে এই স্থানে হাজির করা হইয়াছে। বাদী বাদশার পক্ষীয় লোকেরা। জ্বেন আলেমদিগকে ইহার বিচারের জন্য ডাকা হইয়াছিল। সকলেই একজন জ্বেন আলেমের উপর এই বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি বললেন, আমি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত থাকিয়া এই হাদিছটী শ্রবণ করিয়াছিলাম, যদি জ্বেনেরা নিজেদের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া সর্প বা অন্য কোন আকৃতি ধরিয়া থাকে, আর কোন মনুষ্য তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত আকৃতিতে মারিয়া ফেলে, তবে সেই মনুষ্য শাস্তিগ্রস্ত হইবে না। বাদশাহ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই মোয়াজ্জেনকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। হজরত মাওলানা সেই জ্বেন আলেমের বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি সঠিক বয়সের কথা বলিতে পারি না, এতটুকু বলিতে পারি, আমি হজরত মুছা, হজরত ইছা (আঃ) নবীদ্বয়ের দর্শন লাভ করিয়াছি, শেষ নবী (ছাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত থাকিতাম, আমাদের বয়স এইরূপ লম্বা হইয়া থাকে। তৎপরে হজরত মাওলানা দেশে ফিরিয়া আসিলেন, যেহেতু তিনি একজন জ্বেন সাহাবাকে দেখিয়াছিলেন, এই হতু তিনি নিজেকে তাবিয়ি বলিয়া অভিহিত করিতেন। চরমাদারির মুঃ আবদুছ ছামাদ ছাহেব নিজের পিতার নিকট শুনিয়াছেন, এক সময় ছা'দুল্লাহপুর হইতে তাঁহার পাল্কি রওয়ানা হইয়াছিল, তিনি সঙ্গিগণকে বলিলেন, আমাকে কাঁঠাল খাওয়াইতে পার কি? তাহারা বলিল, অসময়ে ফাল্গুন মাসে কিরূপে কাঁঠাল পাইব? ইতিমধ্যে একজন লোক পশ্চাতের দিক্ হইতে ডাকিতেছিল, মিঞারা থাম। মাওলানা পাল্কি থামাইলেন। সেই ব্যাক্তি একখানা পাকা কাঁঠাল উপস্থিত করিল। মাওলানা এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আমি কাঁঠাল চাওয়া মাত্র উহা পাইয়াছি, ইহার শোকর আমার দ্বারা কিরূপে আদায় হইবে?

দুইজন রায়পুরী মানুষ বেগমগঞ্জ হইতে ছা'দুল্লাহপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব দুই চারিজন লোকের ভাত তরকারি আনিয়াছেন, কিন্তু লোক প্রায় ২০০ ছিল ঃ- ইহাতে তিনি সকলকে অল্প অল্প করিয়া ভাত তরকারি অংশ করিয়া দিয়া বলিলেন, আমি যতক্ষণ ভক্ষণ না করি, ততক্ষণ তোমরা ভক্ষণ করিওনা। সকলেই তাঁহার সঙ্গে খাইলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে কি? সকলেই বলিলেন, হ্যাঁ।

এক সময় হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহবের নৌকা খানা রায়পুরের খালে ছিল, একটা লোক বেলা ১০ টার সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, অদ্যই ঢাকা হইতে আসিতেছি। তিনি বলিলেন, তুমি কিছু ভক্ষণ কর। সেই নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, আমি চট্টগ্রামে গিয়া জুমা পড়িব। লোকে হজরত মাওলানাকে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, দিল্লীতে কয়েকটা জ্বেন তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই জ্বেনটাও ছিল।

তিনি এক দিবস এশার পরে দুই বাসন ভাত তরকারি উঠাইয়া রাখিতে বলেন, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, দুইজন মেহমান উপস্থিত হইয়াছে।

মাওলানার এক কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিতে কয়েকজন আলেম ও রূপশার কামালদ্দিন তালুকদার উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাওলানা বলেন, অদ্য রাত্রে কলিকাতার বন্দরে কতগুলি জাহাজ লঙ্গর লাগান আছে, কতকগুলি বন্দর ছাড়িয়া যাইবে, ইহা যে ব্যক্তি বলিতে পারিবে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব। ফজরের পরে কামালদ্দিন তালুকদার তাহা সঠিক ভাবে প্রকাশ করেন, কাজেই তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। সেই বংশ মাওলানা আবদুল গণি, মাওলানা অলিউল্লাহ মাওলানা হবিবুল্লাহ ও মাওলানা ছিদ্দিকুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন।

হজরত মাওলানা সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে জেহাদে গমন করিয়াছিলেন, সেই জেহাদে তাহার ললাটে একটী গুলী লাগিয়া তিনি আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কারামতে উহা ফিরিয়া যায়। তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত শহীদগণের লাশের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন, তৎপরে গোপন ভাবে তথা হইতে প্রস্থান করেন।

ছা'দুল্লাহপুরের মাওলানা আহমদুল্লাহ ছাহেব বলিয়াছেন, মাওলানা আবদুল গনি ছাহেব ফার্সি ভাষাতে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের জীবনী লিখিয়াছেন, এই কেতাবখানা মুদ্রিত হয় নাই। তিনি উহাতে দেখিয়াছেন, মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব তিন দিবস পরে চৈতন্য লাভ করিয়া কোন লোকের নিকট হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে সেই ব্যক্তি বলিল, আমি তাহার অবস্থা জানি না, রণজিৎ সিংহের লোকেরা তাহার লাশের বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। কিন্তু আমি জেহাদের শেষ সময়ে একটী লোককে উড়িয়া পাহাড়ের উপর যাইতে দেখিয়াছি। মাওলানা ছাহেব ইহা শুনিয়া সেই পাহাড়ের উপর গমন করেন, তিনি প্রত্যেক ওয়াক্তে হজরত সৈয়দ ছাহেবের আজান শুনিতে পাইতেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেন না। তিনি ৩ মাস পাহাড়ে থাকেন, এক দিবস হজরত সৈয়দ ছাহেব স্বপ্নযোগে তাহাকে বলেন, বাবা এমামদ্দিন, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, আমি দেশে ফিরিয়া যাইব না। ইহাতে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাবানিগঞ্জের মাওলানা আজিজুর রহমান ছাহেব তাঁহার শিক্ষক মৌলবী মোহাম্মদ ওমার ছাহেবের মুখে নোওয়াখালীর ছাবের খাঁ দারোগা ছাহেবের বাটীস্থ মাদ্রাছাতে বলিতে শুনিয়াছেন, ছাদুল্লাপুরের একজন মিএরাজি মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের সহিত মক্কাশরিফে গিয়াছিলেন, এক দিবস আছরের নামাজের পরে হেরম শরিফে জমজম কুণ্ডার নিকট মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব আমাদিগকে

বলিলেন, সকলেই হাত উঠাইয়া দোয়া করুন। দোয়া করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন উক্ত মিঞাজি ছাহেব বহু অনুনয় বিনয় করিয়া হজরত মাওলানার নিকট উক্ত সময় দোয়া করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের বোটখানা নদীতে নিমজ্জিত প্রায় হইতেছিল, এই হেতু আমি উহার রক্ষার জন্য দোয়া করিলাম, খোদার মর্জ্জিতে বোটখানা রক্ষা পাইয়াছে। মিঞাজি সেই তারিখ, দিন ও সময়ের কথা মনে রাখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ছাবের খাঁ দারোগার মছজেদে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ছাহেবরে সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হুজুর, আপনি অমুক তারিখে অমুক সময়ে কোন্ স্থানে ছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি নোওয়াখালী হইতে রওয়ানা হইয়া হাতিয়ার নদীতে তুফানে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, বোটে পানি উঠিয়াছিল, খোদার মর্জ্জিতে বোটখানা বাঁচিয়া গিয়াছিল। আমাদের প্রাণ রক্ষা হইল। তৎশ্রবণে সেই মিঞাজি রোদন করিতে করিতে অস্থির হইয়া গেলেন। জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব এই ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের সেই সময়ের দোয়ার কথা উল্লেখ করিলেন। হজরত জৌনপুরী মাওলানা ইহা শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। চরপাতার কারি আহমদ আলি ভূঞা ছাহেব বলিয়াছেন, হজরত মাওঃ এমামদ্দিন ছাহেবের পায়ে জেহাদ কালে যে জখম হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার ডাহিন কপালে গুলী লাগিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, উহার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। তিনি হজরত সৈয়দ ছাহেব হইতে ২৫ বৎসর তরিকতের ফয়েজ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

চরমদারির মুনসী আবদুছ ছামাদ ছাহেব বলিয়াছেন, আমি দক্ষিণ চরপাতার নইমদ্দিন মিঞাজি ও লামচরের মৌলবী আবদুল হালিম ছাহেবের ভ্রাতা আবদুল আজিজ মিঞাজির মুখে শ্রবণ করিয়াছি, মাওলানা কারামত আলি ছাহেব প্রথমে জৌনপুর হইতে

মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবরে সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছা'দুল্লাপুরে উপস্থিত হন, তিনি বাটীতে ছিলেন না, সেই সময় তিনি কুমিল্লার শোজা বাদশার মছজেদে তালেবে-এলমদিগকে পড়াইতেন। মাওলানা জৌনপুরী ছাহেব তথা হইতে কুমিল্লা টাউনের শোজা বাদশার মছজেদে উপস্থিত হইয়া মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তিনি বলিলেন, ভাই, আপনি কি জন্য আসিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি ছেরাতোল-মোস্তাকিম পড়িতে ও বুঝিতে আসিয়াছি। মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব আরবি ভাষাতে বলিলেন, হোজরার মধ্যে আপনার সহিত কথা-বার্ত্তা হইবে। জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব বলিলেন, ইহা হইবে না। আমি তালেবে-এলমগণের সঙ্গে বেঞ্চে বসিয়া ছেরাতোল-মোস্তাকিম পড়িব, কারণ এই যে, আজকাল আলেমেরা গৌরব করিয়া নিজ ওস্তাদকে ওস্তাদ বলিয়া মান্য করেন না, আমি গৌরব নষ্ট করা উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য ভাবে পড়িব। তৎপরে তিনি অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত বসিয়া উক্ত কেতাব পড়িয়া ও বুঝিয়া লইলেন।

আরও তিনি নিজের পিতা মোহম্মদ আকবর মিঞাজির মুখে শুনিয়াছেন, মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব হজরত সৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে থাকা কালে মাওলানা এছমাইল শহিদ ছাহেবের নিকট পড়িতেন। এক সময় হজরত সৈয়দ ছাহেব কোন একটী মছলা মীমাংসার জন্য হজরত মাওলানা শাহ অবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবীর নিকট মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে হজরত শাহ ছাহেব বলিয়াছেন, আমার এক তালেবে-এলমের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা কর। তৎপরে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব ১০ বৎসর যাবৎ মাওলানা মোহাদ্দেছ দেহলবীর নিকট এলম শিক্ষা করেন।

রায়পুরের হাজি আশরাফদ্দিন পণ্ডিত সাহেবের বর্ণনা ঃ—

বেগমগঞ্জের নিকট হাজিপুর গ্রামে প্রথমে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের বাসস্থান ছিল, তিনি বিছানা বিছাইয়া মুরিদগণকে তাওয়াজ্জোহ তা'লিম দিতেন, এক দিবস তাঁহার চাচা সেই বিছানার উপর দিয়া চাষের গরু লইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমার ভাতিজা লোকদিগকে একত্রিত করিয়া হাবিজাভি কি শিক্ষা দিয়া থাকে। হজরত মাওলানা চাচার সম্মানের জন্য কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুরিদ ছাবের খাঁ দারোগা ইহা না পছন্দ করিয়া ছা'দুল্লাহপুরে একটি জমি খরিদ করতঃ ঘর প্রস্তুত করিয়া হজরত মাওলানাকে বলিলেন, হুজুর হাজিপুরে নানা প্রকার অসুবিধা, এই হেতু আমি আপনার জন্য ছা'দুল্লাপুরে একটি বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছি, আপনি তথায় চলুন। তিনি ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তথায় হেজরত করিয়া গেলেন। এক সময় উক্ত ছাবের খাঁ ছাহেব হজরত মাওলানার জন্য একটি লাখেরাজ তালুক খরিদ করিয়া হাজি ছমিরদ্দিন নাজির, ছদরদ্দিন কন্ট্রাক্টর প্রভৃতি সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন হুজুর, এই লাখেরাজ তালুকটা আপনি কবুল করুন। তিনি একখানা লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তুমি দুনইয়ার কুকুর, আর আমাকেও কুকুর বানাইতে চাহিতেছ?

রায়পুরের রহিম বখ্শ মুনশী ও উক্ত আশরাফদ্দিন পণ্ডিত ছাহেব বলিয়াছেন, হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব রায়পুরের মুরিদগণের নিকট হইতে এককার করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহারা যেন বেদায়াতি, হারামখোর ও ফাছেকের দাওত স্বীকার না করেন। এক সময় রায়পুরের এক বাড়ীতে ঢোল বাজনা সহ জেয়াফতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কতক মুরিদ গোস্তের লোভে উক্ত জেয়াফত খাইতে যায়। রহিম বখ্শ মুনশী, আবদুল মিএগজি ও অন্যান্য কয়েকজন লোক গোস্তের মধ্যে মুরগীর বিষ্ঠা দুর্গন্ধ বুঝিতে পারিয়া জেয়াফত না খাইয়া ফিরিয়া আসেন। মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব

সেই সময় রুপশা হইতে রায়পুর পৌঁছিলে, তাহারা পুনরায় তওবা করেন ইহাতে মাওলানা বলেন, এই তওবাই ঠিক হইয়াছে। উক্ত পণ্ডিত সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব মাওলানা কারামত আলি ছাহেবকে দাওয়াত দিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে হোগলার চেটাই বিছানা ছিল, জৌনপুরী মাওলানা উহার উপর বসিলেন, মাটীর বাসনে করিয়া তাঁহার খাদ্যসামগ্রী আনায়ন করা হইয়াছিল ইনি কিছুই বলেন নাই, কিন্তু হিন্দুস্তানি সঙ্গিরা এইরূপ বিছানা ও বাসন দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি বাঙ্গালরি দাওত স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা ভদ্র লোকের সম্ভ্রম করিতে জানে না। জৌনপুরি হজরত মাওলানা এমামদ্দিন সাহেবকে দরিদ্র ধারনায় কতকগুলি চিনার বাসন খরিদ করিয়া বোটে রাখিয়া দিলেন। এক সময় মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব উক্ত জৌনপুরী হজরতের বোটে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে খরিদা বাসনগুলি নজর দিলেন, ইহাতে মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি কি এইরূপ বাসন খরিদ করিতে পারি না, কিন্তু আমি এরূপ ফেরয়াওনি চাল পছন্দ করিনা। ইহাতে জৌনপুরী হজরত নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বশিকপুরের মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেব বলিয়াছেন, আমি কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি, বশিকপুরের নিকটবর্ত্তী বড়লিরা গ্রামে একজন শরিয়ত বিদ্রোহী প্রধান ছিল, সে ব্যক্তি কিছুতেই তওবা করিতে রাজি হইত না। একদিবস মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। একজন ইশারা করিয়া মাওলানা ছাহেবকে বলিল, এই প্রধান লোকটি হেদাএত পাইলে সমস্ত গ্রামের লোক হেদাএত পাইবে। হজরত মাওলানা ছাহেব তাহাকে ছালাম করিয়া বলিলেন, এই লোকটিও মোমেন। অমনি সে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া যায়। গ্রামবাসিগণ ও হেদাএত স্বীকার করিলেন।

উক্ত মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেব তাঁহার ওয়ালেদ মুনশী

মোহম্মদ অলিউল্লাহ ছাহেবের মুখে শুনিয়াছেন, আগরতলার রাজার স্ত্রীর উপর একটা দুষ্ট জ্বেনের আছর ছিল, রাজা রাত্রিতে তাঁহার কামরাতে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। বহু তদবীর করিয়াও কোন উপকার হয় নাই। রাজা মাওলানা এমামদ্দিন সাহেবের বোজর্গীর কথা শুনিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আগরতলায় আনিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে তিনি তথায় যাইতে রাজি হন নাই। অবশেষে রাজা বাহাদুর নওয়াখালীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য অফিসারগণের সুপারিশ ধরিলে, মাওলানা ছাহেব তথায় উপস্থিত হন। জ্বেনটি তৎক্ষণাৎ হাজির হইয়া বলিল, হুজুর আমাকে হুকুম করিলেই আমি চলিয়া যাইতাম, আপনি কেন কষ্ট করিয়া আসিলেন? সেই সময় হইতে রাণী সুস্থ হইয়া যায়। মাওলানা সাহেব বলেন, অদ্য যেন কেহ রাণীর নিকট না যায়, তিনি গাঢ় নিদ্রায় আছেন। অনেক সময় পরে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দরবারের লোকেরা জ্বেন দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, জ্বেন দেখার কোন দরকার নাই। তাহারা অতিরিক্ত অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন, আচ্ছা আপনারা উহা দেখিতে পাইবেন। অমনি সমস্ত বাড়ী অগ্নিময় হইয়া যায়, দরবারে লোকেরা ইহা দেখিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তৎপরে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়, পরে মাওলানা তথা হইতে চলিয়া যান।

মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেবরে বর্ণনা ঃ—

বশিকপুরের পীর হজরত শাহ মোহাম্মদ দাএম আনছারি সাহেব ছিলেন, তিনি তাঁহার মুরিদগণসহ নামাজ রোজা করিতেন, অবশিষ্ট লোকেরা শরিয়তের পায়বন্দী করিত না। তিনি তাঁহার দুই পুত্র শাহ আহমদুল্লাহ ও শাহ আবদুল্লাহকে ত্যাগ করিয়া এন্তেকাল করেন। মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব তথায় আগমন করিলে তাঁহারা উভয়ে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া খলিফা নির্ব্বাচিত হন।

আরও তিনি হাফেজ মোহম্মদ রেজার মুখে শ্রবণ করিয়াছেন,

এক সময় ছাদুল্লাপুরে মুরিদেরা বলিতেছিলেন, হুজুর অলি লোকেরা নাকি পানির উপর দিয়া হাটিয়া থাকেন, তিনি বলিলেন, হাঁ। এশার নামাজ পরে অনেকে দেখিতে পাইল যে, মাওলানা সাহেব বাটীর নিকটস্থ খালে পানির উপর দিয়া হাটিতেছেন।

ছা'দুল্লাহপুরের মাওলানা আহমদুল্লাহ ছাহেব নিম্নোক্ত কয়েকটি রেওয়াএত করিয়াছেন ঃ—

(১) এক দিবস একজন লোক মাওলানা এমামদ্দিন সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া খড়ম পায়ে পুষ্করিণীর পানির উপর দিয়া হাটিয়া যাইতেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা ইহা দেখিয়া মাওলানা ছাহেবের নিকট এই ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। তিনি সেই দরবেশের শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তোমার শরীরের আটটি শীরা জেকের করিতেছে, এইজন্য তুমি বোজর্গী দেখাইবার জন্য পানির উপর দিয়া হাটিতেছ। আর আমার শরীরে সমস্ত শীরা জেকর করিতেছে, আমি ইচ্ছা করিলে বাতাসের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারি কিন্তু আমি ইহা লোকদিগকে দেখাই না।

(২) মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব বাল্যকালে বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি বহু জামানা পরে বাটী উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা মাতাকে বলিলেন, বৃদ্ধা মাতা, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি? তিনি বলিলেন, না। তখন তিনি বলিলেন, আপনার কোন পুত্র ছিল কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, এমামদ্দিন নামক একটি ছেলে ছিল, সে বাল্যকালে নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সে কোন কালে মরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, মাতা আমি আপনার সেই এমামদ্দিন। মাতা ইহা শুনিয়া আনন্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

(৩) কয়েক বৎসর গত হইল, মাওলানা ছাহেবের বাটিতে কয়েক রাত্রে অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল,

নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া ইহার কারণ বুঝা গেল না। মাওলানা ছাহেবের নাতি মৌলবী ছিদ্দিকুল্লাহ ছাহেব বাটীর চারি দিক তা'বিজ পত্র লটকাইয়া কিম্বা পুতিয়া দিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তিন দিবস পরে জোহর অন্তে একটি অপরিচিত লোক মৌলবী ছিদ্দিকুল্লাহ ছাহেবকে বলিলেন, হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব ১৪ শত জেনকে মুরিদ করিয়াছিলেন, তিনি হজ্জে যাওয়ার সময় একটি জেনকে এই বাটীর রক্ষনাবেক্ষণ করিতে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই জেনটি এন্তেকাল করিয়াছেন, তিনি আমাকে খলিফা করিয়া গিয়াছেন, আজ তিন দিবস এখানে উক্ত জেনদিগের সভা হইয়াছিল, অনেক জেন এই বাটীর রক্ষক হওয়ার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কাহাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে, ইহার মীমাংসার জন্য তিন দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, আমরা এই ব্যাপার মীমাংসা করিয়া লইয়াছি, আপনারা এজন্য কোন ভয় করিবেন না।

(৪) মাওলানার ঘরের একটি কামরাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, করিতে গেলে প্রবেশকারীর দেহে অগ্নি লাগিয়া যায়। বোধ হয় এই ঘরে উক্ত রক্ষক জেন বাস করে।

(৫) যে গৃহে মাওলানার বিবি ছাহেবানি মোরাকবা করিতেন, জুমার দিবসে উহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে।

(৬) তথায় একটি কুলগাছ আছে, অন্য কেহ উহার ফল পাড়িতে পারেনা, এক সময় একটি গ্রামবাসী বালক উহার ফল পাড়িতে উঠিয়া ছিল, জেনে তরাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

(৭) তিনি জুমার দিবস যতক্ষণ জুমা না হইয়ত, গোছল খানায় গোছল করিতে থাকিতেন, গোছলখানা হইতে বাহির হইয়া আসিলে, জুমার সময় হইতে আছর পর্য্যন্ত গৃহ সুগন্ধে বিমোহিত হইত।

(৮) এক দিবস কোন দুষ্ট বদমায়েশ লোক তাঁহাকে গোছল অবস্থায় দেখিবার জন্য একটি বৃক্ষের উপর উঠিয়াছিল, তিনি বৃক্ষের উপর দুষ্টলোকটিকে দেখিয়া শরীর ঢাকিয়া গোছল খানা হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং বলেন, তোমার উপর খোদার গজব পড়ুক। সেই লোকটি বৃক্ষ হইতে নামিয়া জুমা পড়িতে মছজেদে উপস্থিত হয়। নামাজ পড়িয়া বাহির হওয়া কালে মছজেদের খীলান ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পতিত হইয়াছিল, ইহাতে সে মারা যায়।

অন্য লোকের রেওয়াএত :—

মাওলানা বিবি ছাহেবানি মস্ত অলী ছিলেন, তিনি অনেক সময় শবেকদর পাইতেন, যত দিবস তিনি জীবিত ছিলেন সুন্দিপের মাওলানা রমিজদ্দিন ছাহেব তাঁহার বাটীতে দোওয়ার জন্য আসিতেন।

মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেবের রেওয়াএত :—

তিনি হাফেজ মোহাম্মদ রেজা ছাহেবের মুখে শুনিয়াছেন—ছাদুল্লাহপুরে মাওলানা সাহেবের বাটীতে থাকিয়া মৌলবী মোহাম্মদ জমিরদ্দিন ছাহেব তাহার নিকট জেকর শিক্ষ করিতেন, ইনি তথায় এন্তেকাল করিলে সমস্ত বাটী সুবসিত হইয়া পড়ে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। লোকে হজরত মাওলানার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ওগো, ইহা আমার জমিরদ্দিনের সুবাস। জেকর তাহার সর্ব্বশরীর সুগন্ধময় হইয়াছে।

উক্ত মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেব তাঁহার ওয়ালেদ সাহেবের মুখে শুনিয়াছেন যখন ১২৬৫ সালে হজরত মাওলানা হজ্ব করিতে রওয়ানা হন, তখন লোকে তাঁহাকে বলেন, হুজুর, আপনি লোকদিগকে ডাকিয়া অছিএত করুন, তাঁহারা যেন আপনার জামাতা ও বড় খলিফা মৌলবী মোহম্মদ ছমি ছাহেবকে মান্য করিয়া চলেন। ইহাতে তিনি বলেন, আমি এইরূপ অনুরোধ করিতে পারিব না,

যদি সে আল্লাহর ভক্ত হয় তবে আল্লাহ্ তাহার সহায়তা করিবেন, নচেৎ অনুরোধ করিলেও লোকে তাহাকে মানিবে না।

অন্যান্য লোকের রেওয়াএত ঃ—

মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব বহু উপযুক্ত খলিফা ত্যাগ করিয়া হজ্জে গিয়াছিলেন, মুনশী হাটখোলার মৌলবী আবদুল্লাহ, নোওয়াখালী টাউনের মৌলানা আবদুল্লাহ, ভবানিগঞ্জের মুনশী গুড়া মিঞা, চট্টগ্রামের মৌলবী আলিমদ্দিন, বামনির মৌলবী মনিরদ্দিন, ফরাশগঞ্জের মুনশী আলিমদ্দিন, বামনির মৌলবী ফজলোর রহমান, রামনগরের মৌলবি আলাউদ্দিন, চরপাওনিয়ার মৌলবি মোহম্মদ ছমি (তাঁহার জামতা), দাশপাড়ার (পদ্দার) সৈয়দ আমজাদ আলি, রায়পুরার মৌলবি ফজলুল্লাহ, শাহাজাদ পুরের মুনশী মোহম্মদ কামেল, চরমনশার মৌলবি ফজলুল্লাহ, গণ্ডর চরের মৌলবি রইছদ্দিন প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(৩২) নওয়াখালীর লক্ষ্মীপুরা থানার অন্তর্গত চরশাহি গ্রামে মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেবের মজার আছে।

(৩৩) ঐ গ্রামের দক্ষিণে জাফরপুর গ্রামে জনাব সুফি এমামদ্দিন মিঞাজি সাহেবের মাজার আছে। যে কেহ এই হজরতের সহিত বে-আদবি করিত সে তখনই শাস্তি পাইত।

(৩৪) নওয়াখালী টাউনের সাড়ে নয় মাইল পশ্চিমে তেতুলিয়া বাবুপুর গ্রামে মাঠের মধ্যস্থলে এক বোজর্গের গোর আছে, সেই মাঠে ৮/১০ হাত পানি উচ্চ হইলেও উক্ত মাজারটি কখনও ডুবে না।

(৩৫) দালাল বাজারের নিকট গঙ্গাপুরে শাহ হারুন সাহেবের মাজার আছে, ইনি ১৪ বার হজ্জ করিয়াছিলেন এবং মাওলানা এমামদ্দিন সাহেবের খাস মুরিদ ছিলেন।

(৩৬) নন্দনপুরে হজরত হাজি ছমিরদ্দিন নকশবন্দী ছাহেবের মাজার আছে।

(৩৭) তথায় খোদা-প্রেমিক মুনশী হবিবুল্লাহ মোজাদ্দেদ ছাহেবের মাজার আছে।

(৩৮) তথায় হজরত মরয়েম ছানি হাশমতুল্লাহ মোজাদ্দেদি ছাহেবের মাজার আছে। আরও কয়েক জনের মাজার আছে।

(৩৯) লক্ষ্মীপুরা দাএরাতে হজরত আজিম শাহ সাহেবের মাজার আছে।

(৪০) শামপুর দাএরাতে শাহ জকিউদ্দিন সাহেবের মাজার আছে।

(৪১) উত্তর হাতিয়াতে হজরত চাঁদ শাহ ছাহেবের মাজার আছে, এই তিন হজরত ঢাকা আজিমপুর দাএরার মুরিদ ছিলেন।

(৪২) টুঙ্গির পাড়ার শাহ এনাএত কমর বাস্তার মাজার আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরা

(১) মেহার কালিবাড়ী ষ্টেশনের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীপুর গ্রামে রাস্তি শাহ সাহেবের মাজার আছে, ইনি মস্ত তেজ ফয়েজের অলী ও হজরত বড় পীর গওছে আজম ছাহেবের বংশধর। ইনি কাঞ্চনপুরের হজরত সৈয়দ আহমদ তান্নরি ছাহেবের সঙ্গে দিল্লীর

ফিরোজ শাহ তোগলকের জামানায় এদেশে হেদাএত করিতে আসিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক অনেক লাখেরাজ জাএদাদ তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রদান করা হইয়াছিল।

তাঁহার কয়েকটি জ্বলন্ত কারামত নিম্নে লিখিত হইতেছেঃ—

(১) কালিবাড়ীর অতি নিকটে সেই মাজারটী আছে, কিন্তু তাঁহার কারামত এই যে, কালিবাড়ীর ঢাক ঢোল, বাদ্য ও মেলার বহু সহস্র লোকের শব্দ উক্ত দরগার সীমার মধ্যে পৌঁছিতে পারে না, পক্ষন্তরে দরগা শরিফ বাদ দিয়া বহু দুরপথ হইতে উক্ত শব্দ শুনা যায়।

(২) বৃটিশ গর্ভণমেন্টের পক্ষ হইতে উক্ত দরগার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক ৩৬০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়।

হোসেনপুর (লালদিয়া) নিবাসী বন্দে আলি পাটারী সাহেব বলিয়াছেন, এক সময় কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উক্ত নগদ টাকার বৃত্তি লোপ করার আদেশ লিখিয়া কোর্ট হইতে বাহির হইতে বাসস্থানের দিকে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তিনি একটি পুষ্করিণীতে গলাপানি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়েন। আর্দালিরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, আমি চক্ষে কিছু দেখিতে পাইতেছি না।

তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে উদ্ধার করিয়া সিভিল সার্জ্জেন দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন, কিন্তু তিনি কোন রোগ নির্ণন করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে লোকেরা বলিতে লাগিল, আপনি পীর রাস্তি শাহ সাহেবের দরগার ৩৬০ টাকা বৃত্তি লোপ করার নোটিশ লিখিয়াছেন, এই হেতু আপনার এই অবস্থা হইয়াছে। তৎশ্রবণে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উক্ত নোটিশ খানা ছিড়িয়া ফেলিয়া দেন; তৎক্ষণাৎ তিনি চক্ষে দেখিতে পান।

(২) হাজিগঞ্জের অল্প পূর্ব্বদিকে আলিগঞ্জ গ্রামে শাহ মাদার খাঁ নামক একজন অলীর মসজেদ ও মাজার আছে, তাঁহার

ঐরূপ কতক কারামতের কথা শুনা যায়। ইনিও হজরত রাস্তিম সাহেবের ন্যায় অনেক জামানা গত হইয়াছে এন্তেকাল করিয়াছেন।

(৩) শাহতলী ষ্টেশনের নিকটে শাহতলী খোন্দকার বাড়ীতে শাহ মোহম্মদ ছাহেবের মজার আছে, ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন, ইনি দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক শাহতলী মওজাটী নিষ্কর পাইয়াছিলেন। ইনি রাত্রিকালে বাঘের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন। ঢাকার সুবাদার শেখ এনাএতুল্লাহ উক্ত নিষ্কর জাএদাদ বাজাপ্ত করিয়া লওয়ার জন্য উক্ত হজরতের পৌত্র শাহ কলিমুল্লাহর নিকট কয়েকজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাঁহাকে তলব দিলেন, তৎশ্রবণে তিনি নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তিনি এক এক ছেজদাতে বহুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, ইহাতে কর্ম্মচারিরা বিরক্ত হইয়া তাঁহার গৃহে লাঠিদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, অমনি সেই গৃহে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, কিন্তু শাহ সাহেব অক্ষত দেহে উহার মধ্যে বসিয়া থাকিলেন। সুবাদারের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলে, তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি অন্য কোন জাএদাদ চাহিনা, কেবল কবরের স্থান চাহি। সুবাদার তাঁহাকে ৮ কানি জমি দান করিয়া শাহতলী মওজা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

তাঁহার পুত্র শাহ আমানুল্লাহ বাল্যকাল হইতে অলি হইয়াছিলেন, এক দিবস একজন ভক্ত শাহ কলিমুল্লাকে একটা পাকা কাঁঠাল উপঢৌকন দিতে আনিয়াছিল, তাঁহার পুত্র উহা খাওয়ার জন্য চাহিতে থাকেন, কিন্তু সেই লোকটী ছলনা করিয়া বলিয়াছিল, ইহা কাঁচা কাঁঠাল। তৎশ্রবণে পুত্র বলিলেন, যদি কাচা হয়, তবে লইয়া যাও। তৎপরে ভক্ত উহা শাহ ছাহেবের নিকট উপস্থিত করিলে, উহা কাঁচা কাঁঠালে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া বলিতে লাগিল হুজুর, আমি পাকা কাঁঠাল আনিয়াছি, উহা কাঁচা হইয়া গিয়াছে। শাহ ছাহেব বলিলেন, পথি মধ্যে কোন লোকের

সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি? সে বলিল, হাঁ আপনার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি এইরূপ বলিয়াছিলাম, তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। শাহ ছাহেব বলিলেন, আর উহা থাকিবে না।

এক সময় উক্ত শাহ আমানুল্লাহ এক ছড়া কলা কাটিয়া আনিয়াছিলেন, শাহ সাহেব বিবিকে বলিলেন, কে কলার ছড়া কাটিয়া আনিয়াছে? তিনি বলিলেন, আপনার পুত্র উহা আনিয়াছে। শাহ সাহেব তিরষ্কার করিয়া বলিলেন, আমার বিনা অনুমতিতে কেন এরূপ করিল? পুত্র ইহা শুনিয়া কলা ছড়া গাছে লাগাইয়া দিল উহা পূর্ব্বের ন্যায় জোড়া লাগিয়া গেল। শাহ সাহেব উহা দেখিয়া বলিলেন, ইহা কে করিয়াছে? বিবি বলিলেন, আপনার পুত্রই ইহা করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, ইহার রাগ বেশী, ইহার দ্বারা লোকের ক্ষতি হইবে, আমি এইরূপ ক্ষতিকারি পুত্র চাহি না। ৭ দিবসের মধ্যে সেই পুত্র এন্তেকাল করেন।

শাহ কলিমুল্লার নাতি পীর বখশ মিঞা ছিলেন, এই নাতির আমলে একজন চোর রাত্রে কাঁঠাল চুরি করা উদ্দেশ্যে গাছে উঠিয়া কাঁঠাল ধরা অবস্থায় প্রভাত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভাতে পীর বখশ মিঞা তথায় উপস্থিত হইয়া চোরটিকে গাছে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যখন একটা কাঁঠাল চাহিলে, পাইতে, তখন কেন আমার গাছের কাঁঠাল চুরি করিতে আসিয়াছ? তাহাকে একখানা কাঁঠাল দিয়া বিদায় দিলেন। এক সময় গোপাল ধোবার বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল, সে লৌহা গড়ের হিন্দু জমিদারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল হুজুর, পীর বখশ মিঞা আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহার বিনা ইঙ্গিতে এই ডাকাতি হইতে পারে না। জমিদার কয়েকজন বরকন্দাজ তাঁহাকে ধরিয়া লইতে পাঠাইলেন। তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, বরকন্দাজেরা তাঁহার ভ্রাতা আবদুর রাছুলকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। যখন তাহারা আলগীর ক্ষেয়া ঘাটে

উপস্থিত হইল, তখন পীর বখশ মিঞার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি ভ্রাতার মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল, তাহাদের যাহা ক্ষমতা থাকে করুক। বরকন্দাজেরা অনিমেষ নেত্রে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া থাকিল, কিছুই করিতে সক্ষম হইল না।

পীর বখশ মিঞার নাতি নওয়াব আলি মিঞা, তাঁহার আমলে একজন অতিথী তাঁহার বাটিতে নৌকাযোগে উপস্থিত হইয়াছিল। নৌকার মাঝি তাঁহার বাটীর একটা বড় তাল না বলিয়া লইয়া নৌকর মধ্যে রাখিয়াছিল। সে সমস্ত রাত্রি নৌকা চালাইয়া প্রভাতে সেই খানেই নৌকা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, নওয়াব আলী মিঞা ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি কি আমার বাড়ীর কোন জিনিষ না বলিয়া লইয়াছ? সে বলিল হাঁ, একটি তাল লইয়াছি। ইনি তাহাকে সেই তালটি দিয়া বিদায় দিলেন। নওয়াব আলি মিঞা বলিয়াছেন, ইহা প্রাচীন পীরগণের কারামত।

(৪) কুমিল্লা টাউনের দারোগা বাড়ীতে শাহ মাওলানা আবদুল্লাহ গাজিপুরী ছাহেবরে মাজার আছে, ইনি এন্তেকালের পূর্ব্বে পীড়িত অবস্থায় অসময়ে আম খাইতে চাহিয়াছিলেন। লোকে বলিয়াছিল, হুজুর এখন উহা পাওয়া যাইতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন, হুজুর এখন উহা পাওয়া যাইতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা বাজারে চেষ্টা কর। তাহারা বাজারে গিয়া একটি লোকের নিকট দুইটা আমফল পাইয়া খরিদ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন।

(৫) কুমিল্লা টাউনের কালিয়াজুরিতে হজরত বাবা শাহ আএনদ্দিন সাহেবের মাজার আছে।

একজন দেশওয়ালির একটি গাভী বাচ্চা প্রসব অন্তে মরিয়া যায়। বাচ্চাটি মাতার বিচ্ছেদ শোকে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল।

শাহ সাহেব উহা জানিতে পারিয়া গাভীটির কান ধরিয়া বলিয়াছিলেন, উঠ যাও। অমনি গাভীটা জীবিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তিনি বর্ত্তমান মন্ত্রী ফারুকি ছাহেবকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের বাটীস্থ অমুক বৃক্ষটি যত দিবস জীবিত থাকিবে, ততদিবস তোমাদের উন্নতি থাকিবে।

(৬) তাঁহার মাজারের নিকট বাবা গোলাব শাহ নামক এক বোজর্গের মাজার আছে।

(৭) দাউদ কান্দি থানার এলাকায় সোনারচর গ্রামে খাজা গোলজার শাহ সাহেবের মাজার আছে, ইনি মস্ত অলী ছিলেন।

(৮) শোজা বাদশার মছজেদের সন্নিকটে বাবা শাহ খোলতা ছাহেবের মাজার আছে।

(৯) জগন্নাথপুরে বাবা শাহ করম আলি ছাহেবের মাজার আছে।

(১০) আখাউরার নিকট খড়মপুর গ্রামে হজরত সৈয়দ আহমদ ওরফে কল্লা শহিদের মাজার আছে, ইনি হজরত গওছে অজম ছাহেবের বংশধর, হজরত শাহ জালাল এমনি ছাহেবের মুরিদ। কথিত আছে, কোন হিন্দু রাজা বা যোগী তাঁহার শিরচ্ছেদন করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহার কাটা মুণ্ড নদীতে ভাসিতে ভাসিতে একজন জেলের জালে আবদ্ধ হইয়া যায়। সেই কাটা মুণ্ড কলেমা পড়িতে পড়িতে বলিতে থাকে, তোমরা সমস্ত জেলে মুসলমান হইয়া যাও এবং আমার মুণ্ডকে সযত্নে গোর দিয়া রাখ, নচেৎ তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তথাকার ৩৬০ ঘর জেলে সকলেই মুছলমান হইয়া যায়। এখন তাহারাই উক্ত কল্লা শহীদের দরগার খাদেম হইয়া আছেন। তাঁহার গলাতে এক ছড়া তছবিহ ছিল, উক্ত তছবিহ হইতে একটি বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, উহার

দানাগুলি অবিকল তছবির ন্যায়, আমি উহা দেখিয়াছি। ইহা তাঁহার কারামত।

(১১) লালমাই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে চাঁদশ্রীগ্রামে হজরত ফজল মিঞার মাজার আছে। একজন তালুকদার সাহেব তাঁহার এন্তেকালের পরে তাঁহাকে আজমীর শরিফে দেখিতে পান। ইহাতে তিনি তালুকদার ছাহেবকে বলেন, তুমি আমার আজমীরে থাকার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

তাঁহার নিকট বাঘের দল আসিয়া তাঁহার কদমবুছি করিয়া যাইত। লাকশামের ৪ মাইল দক্ষিণে আতাকরা গ্রামে হাজি রহিমদ্দিন ছাহেবের বাটী, ইনি বলিয়াছিলেন, আমি এক সময়ে হজরত শাহ ফজল সাহেবের সাক্ষাতের জন্য যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে আমার সম্মুখে একটি বাঘ আসিয়া হানা দেয়। আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় বাঘটি চিৎকার করিয়া পলায়ন করে। আমি চৈতন্য লাভ করিয়া শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, তোমার আসিতে এত দেরী হইল কেন? তদুত্তরে আমি বাঘের আক্রমণের কথা প্রকাশ করিলাম। শাহ সাহেব বলিলেন, আমি ওজু করিতে করিতে তোমার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বদনা নিক্ষেপ করিয়া বাঘটীকে তাড়াইয়া দিয়াছি। বদনা তথায় পড়িয়া আছে, তুমি লইয়া আইস। আমি তথায় গিয়া বদনা লইয়া আসি।

তিনি এন্তেকালের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, একজন রঙ্গীন বসন পরিহিত লোক আমার জানাজা পড়িবেন। শেখ আবদুল্লাহ গাজিপুরী ফজরে উঠিয়া বলিলেন, আমি একস্থানে যাইতেছি, তৎপরে তিনি চাঁদশ্রী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জানাজা পড়েন।

(১২) ফরিদগঞ্জের নিকট কেরওয়ারচর গ্রামে মাওলানা শাহ আবদুল মাজিদ ছাহেবরে মাজার আছে, ইনি ফুরফুরার হজরতের মুরিদ, মস্ত তেজ ফয়েজের অলী। তথাকার আফছারদ্দিন পাটোয়ারি

ছাহেবের বর্ণনা— তিনি উক্ত মাওলানা ছাহেবকে অভক্তি করিতেন, এমন কি পাটোয়ারি বংশের লোকেরা সমাজচ্যুত করিয়া তাঁহার পাল্‌কী পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এক দিবস উক্ত পাটোয়ারী ছাহেব রাত্রি ১১ টার সময় চাঁদপুর হইতে রওয়ানা হইয়া কেরওয়ার চরের দিকে আসিতে ছিলেন, চরের মধ্যে একটী বৃক্ষের নিকট দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, এক দেড় শত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি মনে ভাবিলেন, বোধ হয় কোন ওয়াজের মজলিশ হইতেছে। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইলেন, প্রদীপের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে, খুব নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একটী মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে, একেবারে নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শেষ প্রদীপটা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব বৃক্ষ তলে জেকর করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহারা তাঁহার এত ভক্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পাল্‌কী পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এক সময়ে অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইতেছিল, দুই দিবস লোকেরা আলেম মৌলবীগণ সহ ময়দানে উপস্থিত হইয়া এস্তেছকা নামাজ পড়িলেন, কিন্তু পানি বর্ষণ হইল না। তৃতীয় দিবসে লোকে উক্ত মাওলানা ছাহেবকে পানির জন্য ময়দানে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি একটু ওয়াজ করিয়া দোয়া করিলেন, অমনি বাতাস প্রবাহিত হইয়া বারিপাত আরম্ভ হইল, লোকদের কাপড় ভিজিয়া গেল।

তিনি যে দিবস এন্তেকাল করেন, তাঁহার পুষ্করিণীর বড় বড় মৎস্য অতিশয় লাফালাফি করিয়াছিল, তিনিই উক্ত মৎস্যগুলি পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ছুফি তাজাম্মোল হোসেন ছাহেব বলিয়াছেন, উক্ত মাওলানার একটী জ্বেন মুরিদ তাঁহার বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং সেই জ্বেন উক্ত ছুফি ছাহেবের নিকট কামালাতেরেছালাতের তাওয়াজ্জোহ লইয়াছিলেন। ছুফি ছাহেব বলিয়াছেন, কেহ রাত্রে তাঁহার গোর শরিফের নিকট গেলে গলার

শব্দ করিয়া যাইবে, কারণ জ্বেনেরা তথায় ফয়েজ আকর্ষণ করিয়া থাকেন, হাঠাৎ কেহ তথায় গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

(১৩) ত্রিপুরার দুর্গাপুরের মাওলানা নুরজ্জামান ছাহেব বলিয়াছেন, চিতুষি ষ্টেশনের ৫ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে মনোহরগঞ্জ বাজারের ১ মাইল পূর্ব্বদিকে গোয়ালিয়ারা গ্রামে শাহ এনাএত ছাহেব নামক একজন বোজর্গের মাজার আছে। তাঁহার মাজার শরিফের নিকট একটি মেহদী গাছ আছে, কেহ উহার পাতা ছিড়িয়া লইলে, তখন বিপন্ন হইয়া থাকে। আর যদি কেহ তাঁহার গোরের নিকট গিয়া অনুমতি লইয়া উহার পাতা ছিড়িয়া লয়, তবে কোন ক্ষতি হয় না।

তিনি স্বপ্নযোগে উক্ত গ্রামের মৌলবী নুর বখশ দরবেশকে বলিয়াছিলেন, অমুক স্থানে এক সহস্র টাকা আছে, তুমি তাহা উঠাইয়া লও। তিনি উহা উঠাইয়া লইয়াছেন।

(১৪) লাখশামের অন্তর্গত পশ্চিমগা গ্রামে গাজি সৈয়দ হোছাম হয়দর সাহেবের মাজার আছে, ইনি মস্ত কারামত সম্পন্ন অলী ছিলেন।

(১৫) উহার অন্তর্গত গাজির মূড়া গ্রামে শাহ করিম হয়দর ছাহেবরে মাজার আছে, ইনিও বড় বোজর্গ ছিলেন।

(১৬) শাহপুর নওয়া নগরে সৈয়দ জাফর, সৈয়দ আবদুল গফুর, সৈয়দ এবরাহিম, সৈয়দ এছমাইল, সৈয়দ এছহাক, সৈয়দ মৌলবী রওশন আলি, সৈয়দ গোলাম মোরতজা, সৈয়দ শাহ আকরাম আলি, সৈয়দ আম্বিয়া এই বোজর্গদিগের মাজার আছে, ইহারা সৈয়দ হোছাম হয়দর ছাহেবের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

(১৭) নাঙ্গোলকোট ষ্টেশনের দেড় মাইল উত্তর দিকে বান নগর গ্রামে হজরত শাহ রওশন আলি ছাহেবের গোর আছে। প্রথমে তিনি মকরবপুর চৌধুরী বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রঙ্গু মিঞা

চৌধুরী বা তাঁহার কোন পূর্ব্ব পুরুষের নিকট একটু বাসস্থান চাহিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বাঘের বাসভূমিতে তাঁহার থাকার স্থান স্থির করিয়া দেন। ৭ দিবস পরে চৌধুরী সাহেব হস্তী লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, শাহ সাহেব সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন, তৎপরে চৌধুরী সাহেব লৌহ গরম করিয়া তাঁহাকে উহার উপর দাঁড়াইতে বলেন। তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া অক্ষত দেহে ছিলেন। তখন পীর ছাহেব বলিয়াছিলেন, তোমাদের বংশে কেহ ২৫ বৎসরের বেশী আয়ু প্রাপ্ত হইবে না। তৎপরে তাহারা পীর ছাহেবের সেই স্থানটী পরিষ্কার করিয়া দেন। চৌধুরী ছাহেবের বংশে সেই হইতে কেহ ২৫ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকেনা। রেলওয়ে কোম্পানিরা তাঁহার গোরের নিকট দিয়া রেললাইন চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ট্রেন লাইনচ্যুত হইতে থাকে। অবশেষে লাইনটা বক্রভাবে লইয়া যাওয়া হয়। সময় সময় তথায় ট্রেন বন্ধ হইয়া যায়, দোয়া-দরুদ পড়িয়া ছওয়াব রেছানি করিলে, উহা চলিয়া থাকে। অনেক সময় তথায় আস্তে আস্তে গাড়ী চালান হয়।

(১৮) চিতুষি ষ্টেশনের ১ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে খাতাপাড়া গ্রামে সৈয়দ রেজা হোসেন ছাহেবের মাজার আছে। তাঁহাকে দফন করার পরে তাঁহার গোরের মাটি চারি হাত পরিমাণ উচ্চ হইয়া উঠে। এখন সেই অবস্থায় আছে।

পশ্চিম গাঁ নিবাসি নওয়াব আলি হয়দর খাঁ বাহাদুর ছাহেবের দুইটা হস্তী উক্ত কবরের উপর গমন করে। ইহাতে হস্তী দ্বয় মরিয়া যায়। স্বপ্ন যোগে তিনি নওয়াব ছাহেকে বলেন, তোমার হস্তীদ্বয় আমাকে কষ্ট দিয়াছে। তোমার উভয় হস্তী মরিয়া গিয়াছে, আর যে কোন হস্তী তুমি খরিদ করিবে, উহা মরিয়া যাইবে। প্রকৃত ঘটনা তাহাই হইল। নওয়াব ছাহেব এজন্য ১৬ কানি জমি তাঁহার আওলাদকে নিষ্কর দিয়াছেন।

(১৯) নাথের পেটুয়া ষ্টেশনের ৪ মাইল পশ্চিমে দুর্গাপুর

গ্রামে প্রসিদ্ধ ছাড়া ফকির বাড়ীতে একজন অলীর কবর আছে, তিনি প্রথমে যে বাড়ীতে থাকেন, উহা জেলেরা নিলাম করিয়া লয়, এবং উক্ত দরবেশ ছাহেবকে তথা হইতে অন্য স্থানে যাইতে বলে, তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, তুমি কেন আমার বড়ী নিলাম করিলে? তৎপরে তিনি ফকির বাড়ীতে চলিয়া যান। জেলেরা বাড়ী প্রস্তুত করিতে করিতে কলেরাতে সকলেই মরিয়া যায়, এখন উহা মুছলমানদিগের অধিকারে আছে। মুনশী আবদুল্লাহ কবরের পার্শ্বস্থ জমি কাটিতে আরম্ভ করেন, তিনি স্বপ্ন যোগে বলেন, আর অধিক কাটিলে, তোমার ক্ষতি হইবে। মৌলবি লকিতুল্লাহ সাহেব এক রাত্রি কবরের নিকট মোরাকাবা করিতেগিয়া একটী নুর কবর হইতে আসমান পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি বনেল, তুমি চলিয়া যাও, এক্ষণে এস্থলে মজলিশ হইবে।

(২০) ধামতী হইতে ৮ মাইল পশ্চিম দিকে পাঁচপুকুরিয়া গ্রামে হোব্বে আলি শাহ সাহেবের মাজার আছে। তিনি বোজর্গ ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

(২১) কুমিল্লা ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পশ্চিম উত্তর কোণে ময়নামতির নিকটে ফরিজপুর গ্রামে শাহ হেলাল ছাহেবের কবর আছে। তিনি নলের চেটাই নিজের হস্তে প্রস্তুত করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তিনি গুমতি নদীর অপর পার হইতে নল আনিতেন। তিনি কিরূপে নদী পার হইতেন, কিরূপে আবার পার হইয়া ফরিদপুরে আসিতেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেন না, কেহ কেহ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গোপনে গিয়াও ইহার অনুসন্ধান করিতে অক্ষম হইত। তিনি নদীর নিকট অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে নদীর পর পারে দেখা যাইত, আবার তাঁহাকে এই পারে দেখা যাইত। তিনি কাহারও বাড়ীতে কাহারও রন্ধন করা বস্তু খাইতেন না। তিনি ছানি মাহমুদ ভুইএগ্রা নামক একজন লোককে একটী বৃক্ষের উপর উঠিতে হুকুম

করিয়া ছিলেন, সে ব্যক্তি উহার উপর উঠিলে, শাহ সাহেব বলিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত তালুক তোমার অধিকার ভূক্ত হইবে, কিন্তু তুমি চরকুমারির তালুক লইবে না, ইহা মনে রাখিও। ছানি মাহমুদ ভুইএগ্রা মহা-সম্পদ শালী হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে চরকুমারির তালুক লইয়া মামলা মকদ্দমায় জড়িভূত হইয়া সর্ব্বশান্ত হইয়া যায়।

যদি কেহ কোন মকদ্দমার জন্য তাঁহার নিকট যাইত, আর তিনি তাহাকে প্রহার করিতেন, তবে সে আসামী হইলে মুক্তি পাইত কিম্বা ফরিয়াদি হইলে, জয় যুক্ত হইত। তিনি মজযুবের ন্যায় বেড়াইতেন যে দিবস তিনি এন্তেকাল করিবেন, সেই দিবস বলিয়াছিলেন, আমার জানাজা শেখ আবদুল্লাহ গাজিপুরী ছাহেব পড়িবেন। এদিকে শেখ আবদুল্লাহ গাজিপুরী ছাহেব অতি প্রভাতে উঠিয়া একখানা গাড়ী করিয়া ফরিজপুরে পৌঁছিয়া তাঁহার জানাজা পড়িলেন।

(২২) গুণবতী ষ্টেশনের ৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে ডিমাতলী গ্রামের পূর্ব্বদিকে জঙ্গলের মধ্যে কালা-পীর ও গোরা-পীর এই দুই বোজর্গের মজার আছে। বাঘেরা তাঁহাদের কদমবুছি করিত আসিত। আখোরতলার মহারাজা তাঁহাদের সেবার জন্য ২২ দ্রোণ জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন, ১৬ কানিতে এক দ্রোণ হইয়া থাকে।

(২৩) কুমিল্লা টাউনের নিকটবর্ত্তী ময়নামতী গ্রামের ৭ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে উটকারা গ্রামে শাহ কামাল ও শাহ জামাল এই দুই বোজর্গের মাজার আছে। ইঁহারা শ্রীহট্টের হজরত শাহ জাল্লাল ছাহেবের সহচর ছিলেন। তাঁহারা কোন স্থানে নিজেদের হেদাএতের কেন্দ্রস্থল স্থির করিবেন, ইহার অনুমতি চাহিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যে স্থানে তোমাদের উটগুলি দাঁড়াইয়া যাইবে, উহাই তোমাদের কেন্দ্রস্থল হইবে। যে স্থানে তাঁহাদের উটগুলি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানের নাম উটকারা হইয়াছে।

শাহ জামাল সাহেবের একটা কারামত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে তিনি একটি লোককে জাফরগঞ্জ বাজার হইতে ১ পোয়া তৈল আনিতে বলিয়া একখানা গামছা দিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি বলিল হুজুর, গামছাতে তৈল আনিব কিরূপে? তিনি বলিলেন, যাও, উহাতে তৈল আনিতে পারিবে। তৈল গামছাতে চাকা স্বরূপ হইয়া থাকে। শাহ জামালের একপুত্র শাহ এছরাইল ছিল, শাহ জামালের তিন কন্যা ছিল। শাহ এছরাইল কিছু কারামত দেখাইয়াছিলেন, ইহাতে শাহ জামাল অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে আদেশ করেন।

(২৪) এই জন্য শাহ এছরাইল এক চাচত ভগ্নীসহ মজলিশপুরে আসিয়া যেস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, উহা আসন ঘর নামে বিখ্যাত আছে। তথায় বহু কুম্ভকারের বাসস্থান ছিল, তাহারা প্রভাতে আসিয়া দেখিল, কয়েকটি বাঘ উভয়কে বেষ্টন করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কুম্ভকারদিগের শব্দ শ্রবনে বাঘগুলি পলায়ন করিল। তাহারা শাহ এছরাইল সাহেবকে কোন লোকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাহাদিগ ক সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিতে আদেশ করিলেন, তহারা বলিলেন, হুজুর, ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমি, আমরা ইহা কিরূপে ত্যাগ করিয়া যাইব? তিনি বলিলেন এস্থলে তোমাদের পূজাপর্ব্ব হইতে পারিবে না। সেই হইতে পূজা কালে ছাগল বলীদিতে গেলে, বলী হইতনা, অন্য কোন পূজা ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না, তহারা ইহা দেখিয়া তথা হইতে সদলবলে প্রস্থান করিল। সেই স্থানটি এখন ভাবেল্লা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার চাচত ভগ্নী ছিল কেহ কেহ এজন্য তাঁহার উপর অযথা দোষারোপ করিতে ত্রুটি করে নাই। তৎশ্রবনে তিনি চাচত ভগ্নীকে উটকারায় চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি এরূপ কারামত সম্পন্ন ছিলেন যে তিনি উটকারায় ফিরিয়া না যাইয়া মাটীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এই ভারেন্নাতে শাহ নুরদ্দিন ছাহেবের মাজারও আছে। ইনি ঐ বংশধর হইবেন। শাহ এছরাইল ও শাহ নুরদ্দিন এই দুই নামে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি আছে, উহাদের আয় প্রায় সহস্র টাকা হইবে।

যদি কেহ ঐ মাজারের নিকট দিয়া পাল্‌কী কিম্বা ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

(২৫) আদিমাপুর গ্রামে সৈয়দ আখতারোজ্জামান ও সৈয়দ নোরোজ্জামান এই দুই বোজর্গের মাজার আছে, তথায় একটা পুরাতন মছজেদ আছে।

(২৬) ফরিদগঞ্জ থানার এলাকায় পরগণা সিংহের গাঁর অন্তর্গত চরমাদারি গ্রামে হজরত শাহ সামছ (সামছদ্দিন) নামক একজন মস্ত অলির কবর আছে।

কথিত আছে, তিনি পেটের নাড়ি বাহির করিয়া নদীতে ধুইতেছিলেন, একজন যুগী ইহা দেখিতে পাইয়াছিল, হজরত শাহ সাহেব যোগীকে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিছু দিবস পরে সে উহা প্রকাশ করিয়া মরিয়া যায়।

একজন লোক তাঁহার দরগার পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন, তিনি একবার জাল ফেলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি প্রথম বার জাল ফেলাতে মৎস্যগুলিতে জালপূর্ণ হইয়া যায়। সে দ্বিতীয়বার লোভের বশীভূত হইয়া জাল ফেলে, ইহাতে সমস্ত রাত্রে জাল আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং সে অন্ধ হইয়া থাকে প্রভাতে তিনি ধমকাইলে, জাল তুলিয়া চক্ষুতে দেখিতে পাইয়া রওনা হইয়া গেল।

কেহ তথা হইতে পাল্‌কীতে আরোহণ করিয়া কিম্বা জুতা পায় দিয়া গেলে, রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে কেহ সেই দরগাহ শরিফের বাঁসের কুঞ্চি লইতে পারে না, লইলে মহা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে।

কাউনিয়া গ্রামের খোরশেদ ভূইঞার হাত পা অবাশ হইয়া গিয়াছিল, অনেক ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। একরাত্রে স্বপ্নযোগে তিনি একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিলেন অনেক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দোয়াপ্রর্থী হইতেছে। তিনিও উক্ত শাহ সাহেবের নিকট দোয়া চাহিলেন, তিনি ফুক দিলেন। অবশেষে শাহ সাহেব বলিলেন, বাবা আমার মাজার শরিফে বড় অত্যাচার হইয়া থাকে, ইহাতে তিনি বুঝিলেন। শাহ সাহেব যেন তাঁহার মাজারের চারিদিকে প্রচীর দিতে ঈশারা করিতেছেন। জাগরিত হওয়ার পর হইতে তাহার পীড়া আরোগ্য হইতে লাগিল। তিনি মাজারের চারি পার্শ্বে প্রাচীর ও একটা নামাজের স্থান প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

উক্ত দরগার নিকটস্থ জমি জমিদারের খাস দখল করিয়া একজন লোককে বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছিল। উক্ত দরগার একজন বোবা খাদেম কোন পিয়াদাকে উহা দখল করিতে দেখিয়া ইশারা করিয়া উহা পীর সাহেবের নিষ্কর ভূমি বলিয়া প্রকাশ করিল। পিয়াদা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তৎপরে সেই পিয়াদার পা পচিয়া যায় এবং সে উক্ত পীড়াতে মরিয়া যায়।

(২৭) ত্রিপুরা জেলার গুণবতী ষ্টেশনের দুই বা আড়াই মাইল পূর্ব্ব দিকে বিজয়করা গ্রামে ছুফি আবদুর রহমান ছাহেবের মাজার আছে। মাধবপুরের মৌলবি মোহাম্মাদ আলি আশরফ ছাহেব বলিয়াছেন, তিনি এশারপরে হোজরায় প্রবেশ করিতেন, লোকে শেষ রাত্রে তাঁহাকে পাহাড়ের দিক হইতে আসিতে দেখিতেন। তাঁহার গরুগুলি তাঁহার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রের কিছু খাইতনা।

তিনি একদিবস কুমিল্লা যাইতে ইচ্ছা করিলেন, খাদেম বলিল হুজুর, ষ্টেশনের নিকট গিয়া জোহর না পড়িলে, ট্রেণ পাওয়া

যাইতে পারেনা। ছুফি ছাহেব বলিলেন, জোহর পড়িয়া বাটী হইতে যাইব না, তিনি জোহর পড়িয়া আস্তে আস্তে রওয়ানা হইলেন, ট্রেণ খানা সিগনালের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল, সাহেব ড্রাইভার অনুসন্ধান করিয়া ট্রেণ বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে নাপারিয়া বিব্রত হইতেছিল, ছুফি ছাহেব তিন খানা টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলে, গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। ছুফি ছাহেব কাছারিতে বসিয়া পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্ব কোনে ঘন ঘন নজর করিতেন, সেই স্থানে তাঁহার মাজার হইয়াছে। তিনি এন্তেকাল করিলে, আছরের সময় তাঁহাকে দফন করা হয়। দফনের পরে মগরেবের একটু পুর্ব্বে অনেক প্রকার পক্ষী আসিয়া বৃক্ষের উপর সমবেত হইয়াছিল, পুষ্করিণীর অনেক মৎস্য ভাসিয়া ছিল। মগরেবের পরে একটী জ্যোতিঃ দেখা গিয়াছিল, পুষ্করিণী ঘর ও মছজেদ উক্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল, কয়েক দিবস যাবৎ উহা হইতে আলোক দেখাযাইত। তাঁহার বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী চৌধুরী ছাহেব তাঁহার পরম শত্রুছিল, কিন্তু এই কারাকত দেখার পরে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়ে। ইনি হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৩১ দিবস পরে এন্তেকাল করেন, ইনি রামপুরের হাফেজ এনাএতুল্লাহ ছাহেবের মুরিদ ছিলেন, মাওলানা —আলাউদ্দিন ছাহেবের শ্বশুর।

(২৮) চরমদারি গ্রামে চেরাগ আলি শাহ নামক কে দরবেশের গোর আছে, পিয়দারা খাজানার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে চেরগের তেলের পয়সা চাহেন তিনি তাহাদের চেরাগে প্রস্রাব করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।

(২৯) হাজিগঙ্গ থানার ৩ মাইল উত্তর দিকে ওড়পুর গ্রামে কাজি করম উল্লাহ পীর ছাহেবের মজার আছে। উহার নিকটস্থ নদীতে উক্ত মাজারের নিকট একখানা ষ্টীমার পৌঁছিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তখন ষ্টীমারের সারেং মাজার শরিফে উপস্থিত হইয়া তাঁহার রুহে ছওয়াব রেছানি করিলে, ষ্টীমার খানা চলিতে থাকে, তথায়

গিয়া জিয়ারত ও ছওয়াব রেছানি করিলে, লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে।

(৩০) চিতুষি ষ্টেশনের নিকট হজরত শাহ শরিফ সাহেব প্রভৃতি কোন বোজর্গের মজার আছে।

(৩১) পাঘাচং ষ্টেশন হইতে পোয়া লাইল পূর্ব্ব উত্তর দিকে মাছিহাতা গ্রামে শাহনুরোল ইছলাম ছাহেবের মাজার আছে।

(৩২) নয়নপুর ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তর দিকে বাগরা গ্রামে হজরত করিম শাহ মোনাওয়ার শাহ প্রভৃতি তিন জন বোজর্গের মজার আছে।

(৩৩) উক্ত ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে বড় শালঘর গ্রামে নেজামদ্দিন ছাহেবের মজার আছে।

(৩৪) উক্ত ষ্টেশনের নিকটে শশিদল গ্রামে পাচপীরের কবর আছে, তাঁহাদের নামে সওয়া-দুইকানি লাখেরাজ জমি আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রাম

(১) সদর টাউনের বখশী বাজারে লালদীঘির পশ্চিম দিকে হজরত শাহ আমানর ছাহেবের মজার আছে, ইনি ঢাকার ছুফি দাএম ছাহেবের পীর মোর্শেদ ছিলেন, ইনি মস্ত তেজ ফয়েজের অলী, কেহ তাঁহার গোরের জিয়ারত করিতে গেলে, হৃদয়ে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

(২) উক্ত দীঘির পূর্ব্বপাড়ে হজরত বদরদ্দিন ছাহেবের

চেল্লা আছে। সাধারণ লোকে তাঁহাকে বদর পীর বলিয়া থাকে। এই স্থানে তাঁহার মাজার আছে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। আনওয়ারোল আওলিয়া কেতাবে উহা তাঁহার কবর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যশোহর খুলনার ইতিহাসের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, চট্টগ্রামে পীর বদরের কবর আছে, ইনি শাহ জালাল সাহেবের সহচর হইবেন। গৌড়ের ইতিহাসের ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, ৮৪৪ হিজরীতে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ বদরুদ্দিন বদরে-আলমের মৃত্যু হয়, বিহার নগরে ইহার সমাধিস্থান বর্ত্তমান আছে।

(৩) ইহার এক মাইল দূরে বদনা শাহ ও জুম শাহ এই দুই বোজর্গের মাজার আছে।

(৪) শহরের ৪ মাইল উত্তরে একটী দরগা আছে, লোকে উহা হজরত বা এজিদ বোস্তামির গোর মজার বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা সত্য নহে, কেননা প্রথমে হজরত শাহ জালাল ইমনি শ্রীহট্টে ৩৬০ জন আওলিয়া সহ আগমন করেন, তাঁহার আগমন ৭৮৫ হিজরীতে হইয়াছিল। তাঁহার সহচরগণ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা সমস্ত আসাম হেদাএত করিয়াছিলেন। হজরত শাহ জালাল তবরেজি পাণ্ডুয়া ও আসামের কতকটা হেদাএত করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু ৬৪২ হিজরীতে হইয়াছিল। বগুড়ার মহাস্থানে হজরত সুলতান মাহি ছওয়ার ৪৩৯ হিজরীতে আগমন করেন।

খান জাহান আলি ৭৯৬ হিজরীতে জৌনপুরে নুতন রাজ্য স্থাপন করিয়া পালিত পুত্র এবরাহিমের উপর রাজ্যভার অর্পন করতঃ খুলনা বাগেরহাটে হেদাএত করিতে যান, তিনি ৮৬৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। আরও যশোহর খুলনার ইততহাসে আছে, খানজাহান আলি চট্টগ্রামের পীর বা এজিদের সহিত সমাক্ষাৎ করেন, হিাতে বুঝা যায়, প্রথমে মুছলান পীরদল ৪৩৯ হিজরীতে

বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের আগমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আরও আনওয়ারোল আওলিয়ার ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত বাএজিদ বোস্তামি ২৬১ হিজরীতে এন্তেকাল করেন, ইহা নাফহাতোল উলছ কেতাবে আছে, তাঁহার মাজার বোস্তামে আছে, ইহা ছকিনাতোল-আউলিয়া কেতাবে আছে। আর কোন কেতাবে দেখা যায় না যে, তিনি চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। কাজেই ইনি অন্য বাএজিদ হইবেন, আমাদের প্রবল ধারণা এই যে, যে সময় হজরত শাহ জালাল ইমনি শ্রীহট্ট হেদাএত করিতে আসেন, সেই সময় ৩৬০ জন আওলিয়া তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদের একজনের নাম সৈয়দ বা এজিদ, ইনিই তথায় চেল্লা করিয়া থাকেন, ইনি পীর খানা জাহান আলীর সমাময়িক ছিলেন। যদি এই স্থানে প্রকৃতই গোর থাকে, তবে এই হজরতের গোর হইবে।

(৪) ইহার পশ্চিম পার্শ্বে ১২ আওলিয়ার গোর আছে, আমরা এখনও তাঁহাদের নাম অবগত হইতে পারি নাই।

(৫) চট্টগ্রামের বটতলী ষ্টেশনের সংলগ্ন বঙ্গী শাহ ছাহেবের মাজার আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে উহার অতি নিকট দিয়া রেল লাইন চালান হইয়াছিল, কয়েক বার ট্রেণ পড়িয়া যায়, তদন্ত করার পরে জানা যায় যে, তথায় একটী কবর আছে। পরে রেল লাইন সরাইয়া লওয়া হয় এবং উক্ত কবরটী কাষ্ঠের বেড়া দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে।

(৬) উহার নিকট কুমাদান পাহাড়ের উপর অনেক বোজর্গের কবর আছে। জনাব ছুফি তাজাম্মোল হোছেন ছাহেব কাশ্‌ফে দ্বারা বলিয়াছেন, তঁঅহারা আরবের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

(৭) ফটিকছড়ি রোডের পশ্চিম দিকে বনবনিয়া শাহ সাহেবের মাজার আছে। তাঁহার এন্তেকালের পরে এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার লাশ বিনা দফনে ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর জীবিত মানুষের ন্যায় তাজা ছিল। লোকে ইহা দেখিয়া তাঁহাকে দফন করিতে গিয়া কলহ করিতে থাকে, শহরের লোকে শহরে দফন করার জন্য এবং যে স্থানে তাঁহার লাশ ছিল তথাকার লোকেরা তথায় দফন করার জন্য বিরোধ করিতেছিল। অবশেষে ফটিকছড়ি রোডের পার্শ্বে তাঁহাকে দফন করা হয়।

(৮) চট্টগ্রামের নাজিরহাট লাইনের ষোল শহর ষ্টেশনের অনতিদূরে শেখ ফরিদের দুইটা কুণ্ডা আছে, উহা পাহাড়ের মধ্যদেশ হইতে প্রবাহিত হয়। তথায় শেখ ফরিদের দুই পদচিহ্ন আছে, কোন ফকির উহার অর্দ্ধেকাংশ লইয়া গিয়াছে। উহার নিকট একটা ছোট পাহাড় আছে, তথায় তাঁহার বৈঠকখানা আছে। ইনি কোন্ শেখ ফরিদ, ইহা স্থির করা কঠিন, হজরত নেজামদ্দিন আওলিয়ার পীর শেখ ফরিদ গঞ্জেশাকার ছিলেন, তাঁহার চট্টগ্রামে আসা সম্ভব হইলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের প্রবল ধারণা এই যে, হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর শেখ ফরিদ আনছারি ছিলেন, ইহা তাঁহার চেল্লা হইতে পারে।

(৯) চট্টগ্রামের নেজামপুরে (মলিয়াশ গ্রামে) হজরত মাওলানা শাহ ছুফি নুর মোহম্মদ ছাহেবের মজার আছে।

মাওলানা আবদুল জব্বার ছাহেব বলিয়াছেন, কেছমত জফরাবাদের মুনশী আবদুল মজিদের মুখে শুনিয়াছি, এক সময় ছুফি নুর মোহাম্মদ ছাহেবকে শায়িরখালীর আবদুল আলি ভুইঞা দাওত করিয়াছিলেন, মালিইয়াশ হইতে উহা ১১ মাইল দূরে। ভাদ্র মাসে অতিরিক্ত বর্ষা, ঝড় ও বন্যা ছিল। ভূইঞা ছাহেবের পাল্‌কী আসিতে দেরী হইতে লাগিল, ছুফি ছাহেব সঙ্গীদিগকে বলিলেন,

আমার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। তোমরা তথায় চলিয়া যাও। তাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া অনেক দেরীতে ভূইঞা ছাহেবের বাটীতে পৌঁছিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। লোকে বলিল তিনি ছুফি ছাহেবকে ৮ টার সময় খাওয়াইয়া শয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন, সুফি ছাহেব কোথায় আছেন? লোকে বলিলেন, তিনি দহলিজে নিদ্রিত আছেন। সহচরেরা ইহা দেখিয়া আর্শ্চয্যন্বিত হইলেন। মৌলবী একরাম আলি (ইছাখালি নিবাসী) বলিয়াছেন, সুফি ছাহেবের একজন মুরিদ রুটির ঝুড়ি মস্তকে লইয়া পাহাড়ের পূর্ব্বধার দিয়া যাইতেছিল, এমতাবস্থায় একটী বাঘ তাঁহার সম্মুখে প্রায় ২০ হাতদূরে উপস্থিত হয়। সে বলিল, খোদা, সুফি ছআহেবের বরকতে আমাকে উদ্ধার কর। এমনি একটী বদনা বাঘের গলদেশে পতিত হইল, বাঘটী চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। মুরিদ সুফি ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, তিনি আছরের প্রথম ওয়াক্তে ওজু করিতে করিতে বদনা ফেলিয়া মারিয়াছিলেন। সুফি ছাহেবের খাস খলিফা মৌলবি একরাম আলি ছাহেব বলিয়াছিলেন, ছুফি ছাহেব বৈঠকখানার উত্তর দরওয়াজায় বসিয়াছিলেন, মিঠান ওয়ালার মৌলবি বোরহানদ্দিন, সেখটোলার মৌলবী বশিরুল্লাহ, চট্টগ্রাম টাউনের মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ ও হিঙ্গুলির মাওলানা ছায়াদ'ত আলি ছাহেব তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ একজন মস্তান চক্ষু রক্ত-বর্ণ, হাতে থলিয়া জানু পর্য্যন্ত কর্দ্দমযুক্ত অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইয়া সুফি সাহেবের নিকট থলিয়াটি রাখিয়া তিন রাত্র-দিবা নিদ্রিত থাকিয়া জাগরিত হওয়ার পরে থলিয়াটি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা পরস্পরে অস্পষ্টভাবে আলোচনা করিতেছিলাম, এই ব্যক্তি কে ছিল? দুই দিবস পরে নামাজ অন্তে সুফি ছাহেব বলিলেন, ইনি কোতব ছিলেন, থলিয়াটি তাঁহার আমানত, তিনি সুফি ছাহেবের নিকট উহা আমানত রাখিয়া ছিলেন। ছুফি ছাহেব কোতবোল আফতাব ছিলেন।

ছুফি ছাহেব হজরত মোজাদ্দেদ ছৈয়দ আহমদ বেরেলির প্রধান খলিফা ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে জেহাদে গমন করিয়াছিলেন। ছুফি তাজাম্মোল হোছেন ছাহেব এক সময় মিরেশ্বরী ষ্টেশন হইতে নামিয়া একটা মছজেদে নামাজ পড়িয়া কাহারও নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দ্রুতগতিতে রওয়ানা হইলেন। কোর্দ্দির মুনশী আবদুল আজিজ পাটোয়ারি ছাহেব তাঁহাকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার সম্মুখের দিকে একটি নুর পথ প্রদর্শক রূপে হজরত ছুফি নূর মোহম্মদ ছাহেবের গোর পর্য্যন্ত দেখিতেছিলাম, এই হেতু কাহারও নিকট পথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক হইয়াছিল না। তাঁহার অন্যান্য কারামতের কথা "মাওলানার জীবনী" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

(১০) ধুম ষ্টেশনের সিকি মাইল পশ্চিম দিকে সোনা পাহাড়ের চিনকি মস্তান সাহেবের মাজার আছে।

(১১) হিঙ্গুলি ষ্টেশনের নিকট শাহ বদলোল মস্তান সাহেবের মাজার আছে।

(১২) চট্টগ্রামের নাজিরহাট রেল লাইনের নাজিরহাট ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে হজরত শাহ মাওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের মাজার আছে। ইনি কলিকাতা-মাদ্রাসা পাঠ্য শেষ করিয়া কোতবোল আফতাব হজরত মাওলানা ছুফি নূর মোহম্মদ নেজামপুরী সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া চিশতীয়া তরিকা শিক্ষা করেন। চর মাদারির শামসুল হক মিঞা বলিয়াছেন, ইনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিতেন, এক দিবস মাদ্রাসার ছুটী হওয়ার পরে গেটের বাহিরে আসিয়া দুইটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করেন। অগ্রগামি লোকটা পশ্চাৎ গামী লোকটাকে বলিল, ইহাকে কিছু দাও। ইনি বলিলেন, সে উহা সহ্য করিতে পারিবে না অগ্রগামি লোকটা বলিলেন, হাঁ পারিবে। ইহা বলিয়া মাওলানা আহমদুল্লাহ ছাহেবের শরীরে ফুক দিলেন। এক

বৎসর পরে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উন্মাদ অবস্থায় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া পানিপূর্ণ ড্রেণে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিলেন, লোকে বলিল, তোমার ভ্রাতা অমুক ড্রেণে পড়িয়া আছে। তৎপরে তাঁহাকে নিজ বাটী ইছাপুরে লইয়া যাওয়া হইল, তিনি উন্মাদের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। এক দিবস চট্টগ্রাম টাউনে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কোর্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট টিপিন খাইতে গিয়াছিলেন, ইনি হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চেয়ারের উপর বসিলেন। ডিপুটী সাহেব উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ডিপুটি সাহেব সেই চেয়ারে বসা মাত্র উন্মাদ হইয়া গেলেন। ডিপুটীর স্ত্রী উক্ত শাহ সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ও দোয়া লইলে, ডিপুটী সাহেব সুস্থ হইয়া যান। তিনি শাহ সাহেবের বাটির দালান প্রস্তুত করিয়া দেন এক সময় শাহ সাহেব মহল্লার মছজেদে জুমার নামাজ পড়িতে গিয়া দেখেন যে, জুমা হইয়া গিয়াছে ইহাতে তিনি কোন লোককে বলিলেন, তুমি আমার বোগলের নীচে দিয়া নজর করিয়া দেখ। সে ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, মক্কাশরিফে লোকেরা নামাজের জন্য ওজু করিতেছে। তিনি বলিলেন, আর আমি তোমাদের দেশে নামাজ পড়িব না, মক্কাশরিফে নামাজ পড়িব।

শাহ সাহেবের একজন মুরিদ ছিল, তাহার পিতা তাহাকে একজন হাফেজে-কোরান স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ করাইয়া দেয়। স্ত্রী এক দিবস স্বামীকে বলিয়াছিল, কোরআন শরিফের উপর কি কেতাব রাখা জায়েজ হইবে? স্বামী কেতাব পাঠকারী আলেম, স্ত্রী কোর-আনের হাফেজ, এই উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। স্বামী উত্তর না দিয়া হজরত শাহ সাহেবের নিকট এই মছলা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, তুমি এক বৎসরে কোর-আন হেফজ করিয়া লও। সে অক্ষমতা প্রকাশ করিল। শাহ সাহেব ক্রয়ান্বয়ে ৬ মাস, ১ মাস, ৬ দিবস, ১ দিবস কোর-আন পড়িতে আদেশ করেন, সে অস্বীকার করিতেছিল। অবশেষে শাহ সাহেব

আছরের সময় তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে চলিয়া আইস। মুরিদ হজরত শাহ সাহেবের সহিত চলিতে চলিতে পাহাড়ে উপস্থিত হইল। দুইটী কৃষক শাহ সাহেব একজন লোক সহ কেন পাহাড়ের দিকে যাইতেছেন, ইহা তদন্ত করার জন্য তাঁহাদের সঙ্গী হইল। শাহ সাহেব মুরিদের হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি আলেফ, লাম, মিম হইতে পড়িতে শুরু কর। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত কোরান কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। দুইটি কৃষকও শুনিয়া শুনিয়া হাফেজ হইয়া যায়।

একদল মোছাফের তাঁহার খেদমতে আসিতেছিলেন, তাহারা ৩০ মাইল দুর পথে ছিলেন, হঠাৎ একটা ব্যাঘ্র তাহাদের উপর আক্রমণ করে, তিনি কাশ্‌ফ দ্বারা ইহা দেখিতে পাইয়া একটা বদনা উক্ত বাঘের মুখে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে বাঘটী পালাইয়া যায়। তাহারা সে বদনাটী লইয়া আসে, লোকে ইহা শাহ সাহেবের বদনা বলিয়া চিনিতে পারে।

চট্টগ্রামের মৌলবী এমদাদ আলি ছাহেব বলেন, এক সময় তিনি জুমা পড়িতে যাইতেছিলেন, বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাঁহার গাত্রে ও কাপড়ে এক বিন্দু পানি লাগিয়াছিল না।

যে সময় বড় ঝড় ও বন্যাতে সুন্দিপ ও চট্টগ্রামের কতকাংশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তখন হজরত শাহ সাহেব ঘরের চাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই দিকে ঝড় ও বন্যার প্রকোপ প্রকাশ হয় নাই। নোওয়াখালী শোজাপুরের মৌলবি করিম বখশ ছাহেব বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহার খেদমতে ও উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটা লোক তাঁহার পায়ে মাথা ঝাকাইয়া ছেজদা করিতেছে, আমি মনে মনে বলিতেছিলাম, এই স্থানে এইরূপ হারাম কার্য্য হয়। অমনি শাহ সাহেব বলিলেন, তোমারা সাবধান এইরূপ হারাম কার্য্য করিও না।

তাঁহার ভাতিজা মাদ্রাছা পাস করিলে, তিনি তাঁহাকে পাহাড়ে পাঠাইয়া দেন। মৌলবী ছাহেব বলিয়াছেন, শাহ সাহেব আমাদের সাক্ষাতে বলিলেন, অদ্য আমার মেহমান আসিতেছে, কিছুক্ষণ পরে মৌলবী গোলাম রহমান সাহেব ৩ বৎসর পরে মজযুব অবস্থায় বাটীতে আসিলেন।

কোন লোক শাহ সাহেবের নিকট গেলে, যে উদ্দেশ্যে গিয়াছে, তিনি নিজেই তাহা বলিয়া দিতেন। মুরিদেরা তাঁহার মাজারের নিকট যে ছেজদা বা কোন শেরক বেদয়াত কার্য্য করিয়া থাকে, ইহার জন্য মুরিদেরা দায়ী হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীহট্ট

শ্রীহট্টে যে হজরত শাহ জালাল মোজার্রেদে ইমনি ছাহেবের মাজার শরিফ আছে, তাঁহার জন্মস্থান ইমন দেশ, তাঁহার পিতার নাম শায়খোশ্ শোইউখ মহমুদ বেনে মোহম্মদ এবরাহিম, ইনি কোরাএশি ছিলেন, তাঁহার মাতা ছৈয়দ বংশোদ্ভবা ছিলেন। তাঁহার পিতা জেহাদে শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন, হজরত শাহ জালাল ছাহেব যে সময় তিন মাসের কম বয়স্ক ছিলেন, সেই সময় তাঁহার মাতা এন্তেকাল করেন। তাঁহার খালু হজরত ছৈয়দ আহমদ কবির তাঁহাকে পশুদুগ্ধ পান করাইয়া প্রতিপালন করেন এবং তাহা কর্ত্তৃক শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জাহেরি ও বাতেনি উভয় এলমে পরিপক্ক হইয়া যান, এমন কি তাঁহা কর্ত্তৃক বহু কারামত প্রকাশিত হয়। তিনি মোজর্রাদ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, তিনি

অবিবাহিত ছিলেন। তিনি নিজের খালুর নিকট তরিকত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময় কেটী হরিণী হজরত আহমদ কবির ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করে যে, হুজুর একটী বাঘ আমার বাসস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, আপনি ইহার প্রতিকার করুন। তৎশ্রবণে তিনি শাহ জালাল ছাহেবকে ইহার প্রতিকারের জন্য পাঠাইয়া দেন। বাঘটী তাঁহাকে দেখিয়া কদমবুছি করিতে থাকে, ইনি বাঘটীকে চপেটাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেন। হজরত ছৈয়দ আহমদ কবির তাঁহার এই কামালিএত দর্শন করতঃ হিন্দুস্তান হেদাএত করার জন্য পাঠাইয়া দেন। বিদায় কালে পীর ছাহেব হোজরা হইতে এক মুষ্টী মৃত্তিকা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, যে স্থানের মৃত্তিকা রং, গন্ধ ও আস্বাদে এই মৃত্তিকার তুল্য হইবে, তথায়, নিক্ষেপ করিয়া নিজের বাসস্থান স্থির করিবা। তিনি হাজী ইউছুফ, হাজি খলিল প্রভৃতি ১২ জন মুরিদ সঙ্গে লইয়া হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রথমে জন্মভূমি ইমনে উপস্থিত হইলেন, তথাকার ফাছেক অধিপতি তাঁহাকে পরীক্ষা করণার্থে একজন লোক কর্ত্তৃক বিষ মিশ্রিত শরবত উপঢৌকন পাঠাইয়া মুরিদ হওয়ার আকাঙ্খা জানাইলেন। হজরত ছাহেব নুরে-বাতেনি দ্বারা এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যে সৎকার্য্য করে সে নিজের জন্য করে, আর যে অসৎ কার্য্য করে, সে নিজের জন্য করে। এই পাত্রটী স্বদেশী গৃহবাসীর জন্য বিষ এবং বিদেশী অতিথির জন্য মধু ও চিনি, ইহা বলিয়া তিনি তাহার দাওত অস্বীকার করিলেন, কিন্তু মিশ্রিত শরবত পান করিলেন, এদিকে ইমনের অধিপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তৎপরে তাহার পুত্র শেখ আলি রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া হজরতের খাদেম হইতে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে ফেরত পাঠাইলেন, কিন্তু অবশেষে রাজ্যভার গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া ১৪ দিবসের মধ্যে পদব্রজে চলিয়া হজরত

ছাহেবের সঙ্গী হইয়াছিলেন। একজন মুরিদকে হজরত ছাহেব উক্ত পীর প্রদত্ত মৃত্তিকা প্রদান করিয়া প্রত্যেক স্থানের মৃত্তিকার সহিত তুলনা ও পরীক্ষা করিতে বলেন, তাহার নাম চাশ্নি পীর হইয়াছে।

হজরত শাহ জালাল (রঃ) দিল্লীতে উপস্থিত হইলে দিল্লীর বাদশাহের পীর ছাহেবর নিকট তাঁহার একজন মুরিদ এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিল যে, একজন খাঁটি খোদা-প্রেমিক কারামত সম্পন্ন অতি পরহেজগার আরবি যুবক দরবেশ এই শহরে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি পথে চলিবার সময় ডাহিন বামে দৃষ্টীপাত করন না, নিজের চেহারা রুমাল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন, তাহার সঙ্গে একটী অতি সুন্দর কিশোর বয়স্ক ছেলে ও কতকগুলি দরবেশ আছে।

তৎশ্রবণে তিনি একজন, মুরিদকে তাঁহার খেদমতে পাইলেন, হজরত ছাহেব নুরে-বাতেনি দ্বারা এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া একটী অঙ্গার জ্বালাইয়া তুলা দ্বারা বেষ্টন করিয়া একটী কৌটাতে বন্ধ করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, তোমার পীরের নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দাও। ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ জ্বলন্ত অঙ্গার তুলাকে দগ্ধ করিতে পারিতেছে না, সেইরূপ রূপবান কিশোর বয়স্ক শাহজাদার রূপলাবণ্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। দিল্লীর পীর ছাহেব কৌটা তুলিয়া দেখিতে পাইলেন যে, জ্বলন্ত অঙ্গার তুলা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে কিন্তু তুলা জ্বলিতেছে না, ইহাতে তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহার জাহেরি ও বাতেনি কামালাতের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হইলেন, দুই জোড়া ধুসর রংএর কবুতর উপঢৌকন পেশ করিলেন, এখনও সেই কবুতরের বংশ হজরতের আস্তানা শরিফে বর্ত্তমান আছে, লোকে উহাদিগকে জালালী কবুতর বলে, এখন সমস্ত শ্রীহট্টে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ জালালি কবুতর খাইলে মহা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে শুনা যায়।

সেই সময়ে শ্রীহট্টে একজন বিধর্ম্মী রাজা ছিল, তাহার নাম গৌরগোবিন্দ, তাহার জন্মস্থান গৌড়ে ছিল। হজরত শাহজালাল গাঙ্গুরওয়ান তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, সে তথা হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়া জাদু বিদ্যার বলে রাজ্য চালাইত, জ্বেন দৈত্যদল অনুগত করিয়া লইয়াছিল, নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। শ্রীহট্ট শহরের পূর্ব্বদিকে টোলটিকর নামক পল্লীতে শেখ বোরহান উদ্দিন আহমদ নামীয় একজন মুছলমান নিঃসন্তান অবস্থায় বাস করিত, সে খোদার দরবারে মানসা করিয়াছিল, যদি তিনি তাহাকে একটী সন্তান দান করেন, তবে সে একটী গো-কোরবাণি করি। হঠাৎ একটা চিল কিম্বা কাক একখণ্ড গোমাংস লইয়া গৌরগোবিন্দের গৃহে নিক্ষেপ করিল। সে গোহত্যা ব্রাহ্মণ হত্যা ধারণায় ক্রোধ ভরে বোরহানদ্দিন আহমদের হস্ত কাটিয়া দিল এবং তাহার নিষ্পাপ সন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলিল, সে অগত্যা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাদশাহ আলাউদ্দিন বেনে মোহম্মদের দরবারে দাদ প্রার্থি হইল। বাদশাহ স্বীয় ভাগিনা সেকেন্দর শাহকে এক শক্তিশালী সৈন্যদল সহ শ্রীহট্টের দিকে প্রেরণ করিলেন। যখন সেকেন্দর গাজি ঢাকার সোণার গাঁর এলাকাতে তাবু স্থাপন করিয়া ছিলেন, তখন গুপ্তচরেরা তাঁহার শ্রীহট্ট আক্রমণের সংবাদ রাজা গৌরগোবিন্দের নিকট উপস্থিত করিল। ইহাতে রাজা জাদু তেলেছমাতের সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া শক্তিশালী দৈত্যগণ দ্বারা গাজি সেকেন্দরের সৈন্য দলের উপর অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল, তাহাদের উপর অদৃশ্যভাবে অগ্নি বর্ষণ হইতেছিল, অথচ তাহারা উক্ত অগ্নি দেখিতে পাইতেছিল না, তাহারা এইরূপ জাদুর সংবাদ অনবগত থাকায় ইহার প্রতিরোধ করার কোন উপায় জানিত না, ইছলামি সৈন্যদিগের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। ইহাতে অনেক সৈন্য দগ্ধীভূত হইয়া নদীতে ডুবিয়া মরিল। গাজি সেকেন্দর এই আকস্মিক বিপদ ও সৈন্যদলের ধ্বংস দর্শনে পশ্চাদপদ হইলেন এবং কিছু দিবস

পরে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই বিধর্ম্মীর উপর আক্রমণ করিলেন, তৃতীয় বার রাজার দেশ আক্রমণ করিয়াও পরাজিত হইয়া অবশিষ্ট ৩৬০ জন সৈন্য সহ দিল্লীর দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে হজরত শাল জালাল ছাহেবের নিকট নিজের সমস্ত অবস্থা প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, যদি তোমার শ্রীহট্টের রাজ্যধিকারের আকাঙ্খা থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল। আমি কোফর ধ্বংস ও ইছলামের প্রাচীর গঠনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।

অন্য রেওয়াএতে আছে, বোরহানদ্দিন আহমদ গাজি সেকেন্দরের পরাজয় দেখিয়া ভগ্নহৃদয় নিরাশ অবস্থায় হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত উদ্দেশ্যে মদিনা শরিফের দিকে রওয়ানা হইল, পথিমধ্যে হজরত শাহ জালাল ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি রাজার অত্যাচার, নিজের দেশত্যাগ ও গাজি সেকেন্দরের কাহাণী দুঃখ সূচক ভাষায় প্রকাশ করিল। ইহাতে তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া নিজের সঙ্গে লইলেন।

এদিকে গাজি সেকেন্দর নিজের মর্ম্মান্তিক যাতনাপ্রদ কাহিণী লিখিয়া দিল্লীতে বাদশাহ আলাউদ্দিনের নিকট লোক পাঠাইলেন, তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত ও চিন্তিত হইয়া দরবারের পরিষদবর্গকে একত্রিত করিয়া বিহিত ব্যবস্থার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। শেষ সিদ্ধান্ত এই হইল, দিল্লীর সৈন্যদলের মধ্যে একজন দীনদার পরহেজগার বোজর্গ আছেন, তাঁহাকে সৈন্যধ্যক্ষ করিয়া শ্রীহট্টে পাঠাইলে ইছলামি সৈন্যদল জয়যুক্ত হইবেন। তাঁহার পরিচয়ের উপায় এই যে, রাত্রিকালে প্রবল বাতাসে যাহার প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হয়, তিনিই সেই কামেল বোজর্গ হইবেন। তৎশ্রবণে বাদশাহ সৈন্যদলকে ময়দানে তাঁবুস্থাপন করিতে আদেশ দিলেন, রাত্রে প্রবল ঝটিকায় সমস্ত লোকের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, কেবল সৈয়দ নাছেরউদ্দিন নামীয় একজন সৈন্যের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল

না। বাদশাহ তাঁহার বংশ পরিচয় লইয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনি বগদাদের খলিফার ঘনিষ্ট আত্মীয়; হিংসুকদিগের হিংসার জন্য দেশত্যাগী হইয়া শাহি সৈন্যদলের অন্তভূক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ যথাবিহিত সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজের সৈন্যদলের সেনাপতি স্থির করিয়া গাজি সেকেন্দরের সহায়তার জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, রাজা গৌরগোবিন্দ এই বোরহানদ্দিনের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যাইতেছি। সৈয়দ নাছেরদ্দিন বলিলেন, বাদশাহ আলাউদ্দিন আমাকেও গাজি সেকেন্দরের সহায়তার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে হজরত শাহ জালালের সহিত যে ৩৬০ যোদ্ধা ছিলেন এবং শাহী সৈন্যদল সমস্তকে লইয়া ঢাকার সোনারগাঁওতে গাজি সেকেন্দরের তাঁবুর নিকট তাঁবু স্থাপন করিলেন। গাজি সেকেন্দর শুকরিয়া আদায় করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া চাহিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আজাদ মানুষ, আমার বাদশাহির আকাঙ্খা নাই, আমি রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার উপর রাজ্যভার অর্পন করিব। যখন তাঁহারা বহ্মপুত্র নদীর উপকূলে উপস্থিত হইলেন, তথায় কোন নৌকা ছিল না, হজরত শাহ জালাল ছাহেব নিজের জায়নামাজ নদীর উপর বিছাইয়া দিলেন, সকলে উহার উপর বসিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহারা রাজার অধিকারভুক্ত চৌকিপরগনায় উপস্থিত হইলেন। রাজার চরেরা তাহার নিকট এই পৌঁছাইয়া দিল যে, একজন দরবেশ ৩৬০ জন যোদ্ধা সহ গাজি সেকেন্দরের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। যখন রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিল, জাদুর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া ইছলামি সৈন্যদলের উপর অগ্নিবান নিক্ষেপ করিতে লাগিল, হজরত শাহ জালাল (কঃ)র কারামতে উক্ত জাদু উলটিয়া

রাজার তাঁবুর মধ্যে প্রকাশিত হইয়া উহা জ্বলিয়া ভস্মে পরিণত হইল। তাহার সৈন্যরা ইহা দেখিয়া বিব্রত হইয়া রাজাকে বলিল, এক্ষণে এই দেশ রক্ষা করা কঠিন, জাদুর ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে না, আমাদের প্রাণ রক্ষা কর, আমরা উক্ত দরবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইব না। ইহাতে সে অস্থির হইয়া পড়িল। তৎপরে তাঁহারা চৌমোনা বাহাদুরপুরের নিকট বোরাক নদীর ধারে উপস্থিত হইয়া জায়নামাজের উপর বসিয়া নদী পার হইয়া গেলেন, তথা হইতে পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্ট শহরের দক্ষিণ দিকে জালালপুরে উপস্থিত হইলেন। গৌরগোবিন্দ তাঁহাকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে লৌহনির্ম্মিত ধনুক হস্তীর উপর স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইল, যদি আপনি এই ধনুকে তীর লাগাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি বিনা যুদ্ধে নিজের সম্পত্তি ও দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। শাহ জালাল ছাহেব বলিলেন, যাহার আছরের নামাজ কাজা হয় নাই, সেই ব্যক্তি ইহা করিবেন। সৈয়দ নাছেরদ্দিন ছাহেবরে আছর কাজা হয় নাই, তিনিই তাঁহাকে তীর লাগাইতে বলিলেন, তিনি সজোরে উহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শাহ সাহেব আত্মিক ফয়েজ নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে তিনি তীর লাগাইতে সক্ষম হইলেন। রাজা ইহা দেখিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া কাছাড়ের দিকে নিরুদ্দেশ অবস্থায় মরিয়া গেল। কেহ কেহ বলেন, পীর ছাহেব শহরে প্রবেশ করার পূর্ব্বে নিজের রাজধানি গড়দোওয়ার হইতে পলায়ন করিয়া শহরের এক প্রহর দুরপথে পেচাগড় পর্ব্বতে বাসস্থান স্থির করিয়া মরিয়া যান, কখন কখন কেহ কেহ উক্ত স্থান দেখিতে পাইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, সে প্রস্তর হইয়া কমর পর্য্যন্ত জমিতে ধবসিয়া যায়। তৎপরে হজরত শাহ ছাহেব শহরের দক্ষিণ দিকস্থ সুর্ম্মা নদী পার হইয়া ৮৬১ হিজরীতে অনেকের মতে ৭৮৫ হিজরীতে শহরে প্রবেশ করেন, তাঁহার শুভাগমনে সমস্ত শহর আবাদ হইয়া যায় তিনি রাজার রাজ্য গাজি সেকেন্দরকে

প্রদান করেন। তাঁহার পীর যে মৃত্তিকা প্রদান করিয়াছিলেন; উহা এই শহরের মৃত্তিকা তুল্য প্রমাণিত হইল। তিনি হাজি খলিল, হাজি ইউছফ ও ইমনের শাহজাদা প্রভৃতিকে সঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ বোজর্গকে হেদএতের জন্য নানা দেশে প্রেরণ করিলেন এবং নিজেও লোকদিগকে ইছলামে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এক সময় হাজি ইউছফ ছাহেব হজরত শাহ সাহেবকে বলিলেন, শীতকালে শীত বস্ত্রাভাবে আপনার মুরিদানের কষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক সপ্তাহে গাজি সোকন্দর ছাহেব তাঁহার খেদমতে আসিতেন, এবার তিনি খেদমতে উপস্থিত হইলে, শাহ ছাহেব বলিলেন, এবার শীতের প্রকোপ বেশী, দরিদ্রদিগের শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করা বাদশার উপর লাজেম। তিনি ইহার এইরূপ বিপরীত অর্থ বুঝিলেন, শাহ সাহেব বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি আপনার আদেশ মান্য করিতে প্রস্তুত আছি। একটী উচ্চবংশীয় সুন্দর যুবতীকে স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা রাশি দ্বারা সজ্জিত করিয়া উকিল মা'রেফত হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিয়া নিজে শীকার করিতে গেলেন। শাহ ছাহেব গাজি ছাহেবের অজ্ঞানতা বুঝিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, সে ডুবিতেছে, আমাকেও ডুবাইতে চাহিতেছে। গাজি ছাহেব সুর্ম্মা নদী পার হইতেছিলেন, বিনা বাতাসে তাহার নৌকা ডুবিয়া যায় এবং তিনি এন্তেকাল করেন।

প্রজারা তাহার আকস্মিক্ মৃত্যুতে দুঃখিত হইলেন। শাহসাহেব গাজি সাহেবের একজন বুদ্ধিমান বন্ধুর উপর রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। হাজী ইউছফ ছাহেবকে প্রেরিতা যুবতীর সহিত নেকাহ করিতে আদেশ দিলেন। সেই বংশের বর্ত্তমান মাজার শরিফের খাদেমগণ আছেন। তাঁহার কারামতের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। হজরতের সহচর গাজি জেয়াউদ্দিন তাঁহার আদেশে শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে পরগণা চাপঘাটের বন্দাছেল নামক স্থানে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। তিনি হজরত শাহসাহেবের নিকট এই দরখাস্ত পেশ

করিয়াছিলেন, পাহাড় হইতে পানি সুর্ম্মা নদীতে প্রবাহিত হইয়া উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। আপনি তথায় তশরিফ লইয়া গেলে, উহার পানি স্বাস্থ্যকর হইতে পারে। হজরত শাহ্ সাহেব কয়েকজন খাদেম সহ বান্দাছেলের দিকে রওয়ানা হইলেন। কুছি নদীর নিকট একগ্রামে উপস্থিত হইলেন, তথায় কুণ্ডার নামীয় এক দৈত্য থাকিত, যখন সে কোন স্থানে যাইত, এতধুলি উত্থিত হইত যে, আকাশ দেখা যাইত না, তথাকার বাশেন্দাগণ তাহা কর্তৃক যাতনা ভোগ করিত, এই হেতু উক্ত গ্রামটি ধুলি কুণ্ডার নামে অভিহিত হইয়াছে। হজরত শাহ ছাহেব উক্ত দৈত্যকে মারিয়া ফেলিয়া তথাকার লোকদিগকে শান্তি দান করিয়াছিলেন। যখন তিনি বান্দাছেল গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তথায় দেওরাইল নামীয় এক দৈত্য ছিল, তিনি উহাকেও তাড়াইয়া দিলেন, দৈত্য আবেদন করিল, হুজুর-আমি যাইতেছি, কিন্তু এই গ্রামটির নাম যেন দেওরাইল রাখা হয়। হজরত তাহাই স্বীকার করিলেন। তৎপরে তিনি বান্দাছেলে পৌঁছিয়া ফজরের নামাজ পড়িয়া একটী পাথর লইয়া সুর্ম্মানদীতে নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে তাঁহার কারামতে পাথরের অন্য দিকের পানি অস্বাস্থ্যকর রহিয়া গেল, আর এই দিকের পানি স্বাস্থ্যকর হইয়া গেল, এখনও সেই কারামত বজায় রহিয়াছে।

হজরত শাহ জালাল (রঃ) খাদেমগণ সহ নিজের হোজরার বাহিরে বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ তিনি গৌরগোবিন্দের কেল্লা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই কেল্লার মালিক জাহান্নামবাসী হইয়াছে, এখনও তাহার কেল্লা বাকি থাকিল, উহা কেন বিধ্বস্ত হয় না। ইহা বলা মাত্র উক্ত কেল্লা ভাঙ্গিয়া পড়ে ও জমিতে ধ্বসিয়া যায়। প্রাচীন লোকেরা ১৫/১৬ ফুট পর্য্যন্ত জমি খনন করিয়া ইষ্টক ও প্রস্তর পাইয়াছিলেন। মৌলবি হামিদ বখ্ত সাহবের পিতা হাজি মৌলবি ছইদর বখত মরহুম ১২৭৬ হিজরিতে একটি পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া ১০ হাত জমির নীচে পোক্তা প্রাচীর বাহির হইয়া পড়ে, ইহা উক্ত রাজার কেল্লার অংশ বিশেষ।

এক দিবস হজরত শাহ ছাহেব হোজরার নিকট বসিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটী পুষ্করিণীতে শোকরু নাম্নী একটা স্ত্রীলোককে হাত পা ধুইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের আকৃতি, উহার মস্তকে কালবর্ণের কি আছে? বুকে কি ফুলিয়া রহিয়াছে? লোকে বলিল, ইহা একটী স্ত্রীলোকের আকৃতি মস্তকে কেশ বুকে স্তন রহিয়াছে, শিশুরা উহা হইতে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। হজরত বলিলেন, যদি এই পুষ্করিণী না হইত, তবে স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতে হইত না, অমনি পুষ্করিণী ও স্ত্রীলোকটী অদৃশ্য হইয়া গেল, দুই দিবসের পরে স্ত্রীলোকের লাশটী উহার এক পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছিল।

হজরত শাহ সাহেব হিন্দুদিগের পুষ্করিণীর পানি পছন্দ করিতেন না, এই হেতু তিনি একটা কুণ্ডা খনন করিতে আদেশ দিলেন, আর তিনি আল্লাহতায়ালার দরগাতে দোয়া করিয়া বলিলেন, হে খোদা এই খুণ্ডায় স্রোত জমজমের স্রোতের সহিত যোগ করিয়া দাও, ইহা বলিয়া তিনি লাঠির আঘাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ জমজমের কুণ্ডা হইতে একটা ঝরনা প্রবাহিত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইল, উহাতে সোনা চাঁদির রঙের কতকগুলি মৎস্য প্রকাশিত হইল, উক্ত কুণ্ডার পানি অতি স্বচ্ছ ও মিষ্ট, উহা পোক্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার উত্তর দিকে দুইটী পাথরের নালি লাগাইয়া দেওয়া হইয় াছে। রাত্র দিবা পানি প্রবাহিত হইতেছে, উহা পান করিলে, পীড়া আরোগ্য হয়। শ্রীহট্টবাসি আবদুল অহাব নামক একটী লোক হজ্জে গিয়া ফেরত কালে নয়টা সোনার মোহর একটা বাঁসের চোঙ্গার মধ্যে করিয়া জমজম কুণ্ডায় নিক্ষেপ করিয়া হজরত শাহ জালালের রূহে ছওয়াব রেছানি করিয়া বলিল, হে খোদা যদি হজরত সাহেবের কুণ্ডার সহিত এই জমজম কুণ্ডার যোগ থাকে, তবে আমার এই আমানত তথায় পৌঁছাইয়া দাও। শাহ সাহেবের

মাজারের খাদেম শেখ খয়রদ্দিন কুণ্ডা পরিষ্কার করিতে গিয়া উক্ত চোঙ্গাটী পাইয়া গচ্ছিত রাখিয়া দেন। হাজি ছাহেব দেশে পৌঁছিয়া খাদেমগণের নিকট সন্ধান করিয়া উহা পাইয়াছিলেন।

হজরত শাহ সাহেব শ্রীহট্টে আড়াই হাত লম্বা ও দুই হাত প্রস্ত হোজরাতে ত্রিশ বৎসর বন্দিগি করেন, ৬২ বৎসর বয়সে ২০শে জেলকা'দ চাঁদে জুমারাতে এন্তেকাল করেন। ছোহাএলে ইমন প্রণেতা বলেন, তিনি ৮৯১ হিজরী এবং মিষ্টার হান্টার ও অধিকাংশ লোকের মতে ৮১৫ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করেন।

ছৈয়দ নাছেরদ্দিন সাহেব শাহ জালাল সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি স্বপ্নযোগে 'আলমোস্তায়ান' নামের অসংখ্যবার অজিফা করিতে দেখিলাম, আমার মৃত্যু সন্নিকটে হইয়াছে বলিয়া অনুমিতি হয়। তৎপরে তিনি নিজের সঙ্গিগণকে অছিএত করিলেন, আমার লাশ জুমা মছজেদে লইয়া জানাজা পড়িয়া তোমার অন্য দিকে মুখ ফিরাইবে। তাঁহারা তাহাই করিলে শেষে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার লাশ খাটিয়াতে নাই, তাহারা খাটিয়াটি পীর মহাল্লার কবরস্তানে দফন করিলেন, লোকে উহা তাঁহার মাজার বলিয়া জিয়ারত করিয়া থাকে, কিন্তু শরিয়তে ইহা জায়েজ নাই।

উক্ত পীর মহাল্লায় বুদ্ধিদায়ক কুণ্ডা আছে, উহার ইতিহাস এই যে, সৈয়দ নাছেরদ্দিন শাহের একপুত্র সৈয়দ শাহ আহমদ ছিলেন, তাঁহার পুত্র সৈয়দ শাহ আলি ক্রীড়া কৌতুক, ভ্রমণ ও শীকার করিয়া কালাতিবাহিত করিত, পিতার উপদেশে কোন ফলোদয় হইত না। এক দিবস তাঁহার পিতা তাহাকে হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় এক হোজারতে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাত্রিতে হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহার নিকট তশরিফ আনিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখে থুথু দিলেন ও তাহার হাত পা খুলিয়া দিলেন। পিতা প্রভাতে পুত্র বন্ধন মুক্ত অবস্থায় কোরান পড়িতে ও তাহার মুখে ফেনা পড়িতেছে দেখিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র সমস্ত

অবস্থা পরিচয় দিয়া তিনি খোদার শোকর ও হজরতের উপর দরুদ পাঠ করিয়া একটা কুণ্ডা খনন করিয়া উহার মধ্যে মুখের ফেনা নিক্ষেপ করিলেন, যে ব্যক্তি উহার পানি পান করিবে, সুচতুর ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে, এই হেতু কুয়াটীকে জ্ঞানদায়ক কুণ্ডা বলা হয়। পূর্ব্ব জামানায় প্রত্যেক জুমার রাত্রে কুণ্ডার পানি উথলিয়া উঠিত, কিন্তু এক নাপাক ব্যক্তি উহাতে হাত দেওয়ার পর হইতে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দরগার সিড়ি দ্বারা উপরে উঠিলে, যে গুম্বজ বিশিষ্ট দহলিজ দেখা যায় উহা দরবেশদিগের বসিবার স্থান। উহার উত্তর দিকের পথ দিয়া একটু সম্মুখে গেলে, বাম দিকে ঘড়ির ঘর ও ছার কাওম আবু নাছেরের মাজার, তথা হইতে পূর্ব্বদিকে দরওয়াজার ভিতরে চারিটী মাজার দেখা যায়।

প্রথম বর্ত্তমান মৌলবী আবুছইদ মোহাম্মদ আবদুল হাফেজ সাহেবের ওয়ালেদ আবু তোরাব আবদুল অহাব সাহেবের মাজার, দ্বিতীয়টী হাজি খলিল সাহেবের, তৃতীয়টী দরইয়া পীর সাহেবের মাজার, চতুর্থটী হাজী ইউছুফ সাহেবের মাজার, এই চারি জন হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর। তথা হইতে উত্তর পশ্চিম কোণের দরওয়াজা দিয়া গেলে, হজরত শাহ জালাল সাহেবের মাজার নজরে পড়িবে, তাঁহার পূর্ব্বদিকে এয়মনের শাহজাদা শেখ আলির ও উত্তর পশ্চিম দিকে উজির জাদা মকবুল খাঁর মাজার আছে।

শাহ জালাল সাহেবের সঙ্গিগণের নামের তালিকা :—

হাজি আহমদ, আহমদ আউওল, সৈয়দ আহমদ কবির, হাজি আহমদ, ছানি সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ একবাল, শেখ আবুল ফজল, শেখ আমানুল্লাহ, শেখ আহমদ, কাজি আমিনদ্দিন, মোহাম্মদ আইউব এমাম, খাজা একবাল, খাজা আদিনা, খাজা আমিরদ্দিন, খাজা

এখতিয়ার, এমামদ্দিন, এছমাইল আমাবি, আহমদ আব্বাছি, আবুল হাছান, আবুল খায়ের, আবু ছইদ, আবুল আরেজ, আদম খাকি, শেখ ইলইয়াছ, সৈয়দ আমির, সৈয়দ আহমদ-ছানি, সৈয়দ আবুবকর, সৈয়দ আবুল আব্বাছ, সৈয়দ আবুবকর ছানি, শেখ বাজ আহমদ নেশান বরদার, মোহম্মদ আমিন, সৈয়দ বদরদ্দিন, সৈয়দ বোজর্গ, সৈয়দ বাএজিদ, সৈয়দ বাবু, সৈয়দ বদর, শেখ বাহাউদ্দিন বাদার মল্লিক, খাজা বাহাউদ্দিন, খাজা বোরহানদ্দিন কাত্তাল, বোরহানাদ্দি বোরহানা, বাহার আসকারি, পীরে গনি, পীরে পর্ব্বত জাহান, পীর মল্লিক, খাজা পিয়ার, সৈয়দ শাহ তাজদ্দিন, কাজি তাজদ্দিন, তাজমল্লিক, সৈয়দ জালালুদ্দিন, সৈয়দ জমিল, সৈয়দ জওহর সৈয়দ জাহাঙ্গীর, শেখ জামাল, শেখ জগারি মখদুম জায়াফর গজনবী, কাজি জাহান, হাজি জমশেদ, জামালদ্দিন, জালালদ্দিন, জোনাএদ গোজরাতি, চাশনি পীর, সৈয়দ হামজা, শেখ হামিজদ্দিন নারনুলি, শেখ হোছাএন, মখদুম হবিব, হোজ্জাৎ মল্লিক, হোছাএন শহীদ, হবিব গাজি হোছামদ্দিন বেহারি, হাছান খুফি, সৈয়দ খলিলুল্লাহ, সৈয়দ খলিল, হাজি খলিল, খলিল দিওয়ানা, হাজি খেজের, খাস দবীর শেখ খেজের, সৈয়দ দওলত, শেখ দাউদ কোরাএশি, দেলওয়ার খতিব, দাওয়ার বখশ খতিব, দুদ মল্লিক, খাজা দাউদ, দওলদ গাজী, দওলত রোনাএরি, দরইয়া পীর, দওলত বাবু দওলত শহীদ, সৈয়দ রোকনদ্দিন, মখদুম রহিমদ্দিন, রোকনদ্দিন আনছারি, জয়নদ্দিন আব্বাছ, জয়নদ্দিন, হাফেজ জিকরিয়া, জিকরিয়া আরাবি, সুলতান সেকেন্দর গাজী, সেকেন্দর মোহম্মদ, সৈয়দ ছয়ফদ্দিন, শেখ ছলিম, শেখ ছেরাজদ্দিন, শেখ, সেকেন্দর খাজা ছেরাজ, খাজা ছলিম, সেকেন্দর মোহাম্মদ ছানি, সেকেন্দর তবলবাজ, শেখ সোনা, শেখ সাধু, সোনা গাজী, শেখ শরফদ্দিন, কাজি শাহ দিওয়ান, এমাম শুকরুল্লাহ, হাজি শরিফ, শাহ শামছদ্দিন, মোহাম্মদ বেহারি, শেহাবদ্দিন, শরিফ আজমিরি, শাহবাজ আনছারি, শেখ শামছ, ছালেহ মল্লিক, খাজা সুফিয়ানা, শেখ ছদর, শেখ জিয়াউদ্দিন

মোহাম্মদ শেখ জিয়াউল্লাহ, শেখ জিয়াউদ্দিন, শেখ তাহের, খাজা তাইয়েব, সৈয়দ আবদুল জলিল, সৈয়দ আবদুল করিম, সৈয়দ ইছা, সৈয়দ ওমার ছামারকান্দি, সৈয়দ আবদুল মায়ানি, শেখ আলি এয়মনি শাহজাদা, আলি এয়মনি ছানি, শেখ আবদুল আজিজ, শেখ ওসমান, শেখ ইছাছানি, আবদুল মালেক, শেখ ইছা, শেখ আলাউদ্দিন, শেখ আবদুল্লাহ, শেখ আবদুল করিম, আবদুস শুকুর, খাজা আজিজ চিস্তি, আরেফ মোলতানি, সৈয়দ আলম, সৈয়দ আজিজ, আবদুর রহিম, আতাউল্লাহ, হাফেজ আবদুল্লাহ, আবদুল হাকিম, আরেজে আছকারি, খাজা আলি, শেখ ওমার, ওছমানদ্দিন, শেখ ওমার দরইয়ায়ি, হাজি ওমার চিস্তি, হাজি ওমার দাওয়ারি, খাজা ওমার জাহান, শেখ আলি এয়মনি, শেখ আবদুল মায়ানি, কাজি ওমার, খাজা আদ, খাজা ইছা চিস্তি, খাজা ওমার চিস্তি, খাজা আলি, শেখ গরিব, গাজি মূলক হাজি, গাজি গনিম আহমদ, গরিব খাকি, সৈয়দ ফকরুদ্দিন, সৈয়দ ফরিদ, শেখ ফরিদ আনছারি, শেখ ফয়জদ্দি, শেখ ফরিদ রওশন চেবাগ, হাফেজ ফছিহ, ফতেহ গাজী, ফিরোজ আতারি, কাজি ফয়জুল্লাহ, কাজি ফখরুদ্দিন, কাজি ফিরোজ, সৈয়দ কুতুবুদ্দিন, শেখ কুতুবুদ্দিন, মৌলানা কেয়ামদ্দিন, সৈয়দ কাশেম দেকানি, পীর সৈয়দ কাছেম, হাজি কাছেম, কোতবে আলেম, সৈয়দ কবির, শেখ কালু, কামালদ্দিন, করিম দাওয়ারি, কামালে এয়মনি, কেলাঁমিএা, হজরত খাণ্ডা জকমক, হাজি লতিফ, সৈয়দ মোহাম্মদ জাহান, সৈয়দ মোনয়াম, সৈয়দ মোহাম্মদ গজগবি, মোহাম্মদ নুর, সৈয়দ মৌদুদ, সৈয়দ মোস্তফা, সৈয়দ মোহাম্মদ সুলতান শাহ, শেখ মুছা, শেখ মোহাম্মদ কেবারি, শেখ মোহাম্মদ আনছারি, শেখ মহইউদ্দিন, মছউদ মল্লিক, খাজা মানিক, হাজি মাহমুদ, হজরত মোহেব্ব আলী, মোখতার শহিদ, মোহাম্মদ লতিফ, মোহাম্মদ শাহইয়ান, মোহাম্মদ তকি, মোহাম্মদ শোজা, মোহাম্মদ ছালেহ, মালেক মোহাম্মদ, হাফেজ মোহাম্মদ মোজাফফার বেহারি, মোহাম্মদ ছালাহদার, মা'রুফ ছালাহদার, মোহাম্মদ জোনায়দী, শেখ মোহম্মদ

দানা, মোহাম্মদ আমিন, মোহাম্মদ ইয়াছিন, হাজি মোহাম্মদ দরইয়া, হাজি মোহাম্মদ জিকরিয়া, মোহাম্মদ আশেক, সৈয়দ নাছেরুদ্দিন ছেপাহছালার, সৈয়দ নছরুল্লাহ, শেখ নোছরাৎ, মখদুম নেজামদ্দিন ওছমানি, শেখ নেয়ামতুল্লাহ, মোহাম্মদ নকি, নুর মল্লিক, খাজা নাছেরুদ্দিন, নেজমদ্দিন বাগদাদি, নেজামদ্দিন কেরমানি, নুরল্লাহ, নুরোল হোদা, খাজা অজিহুদ্দিন, হয়বাতুল্লাহ খতিব, হোমামদ্দিন, হাশেম চিস্তি, হাজি ইউছোফ, সৈয়দ ইউছোফ, সৈয়দ ইয়াকুব, এহইয়া কারি প্রভৃতি।

(১) শ্রীহট্টের পরগণা হাবিলি মোহরাপুরে ফেঁচুগঞ্জ থানার অধীনে ধারণ গ্রামে শাহ সৈয়দ মহব্বত আলি সাহেবের মাজার আছে।

(২) পরগণা পাথরিয়া গাংকুল গ্রামে মাওলানা শারাফত আলি সাহেবের মাজার আছে। ইনি ঢাকা পইশার চৌধুরি হাটী নিবাসি সৈয়দ আমজাদ আলি মরহুম ছাহেবের খলিফা। ইনি শাহ ফতেহ আলি ছাহেবের খলিফা ছিলেন।

(৩) পরগণা বরায়া ফুলবাড়ী গ্রামে শাহ আবদুল অহাব মরহুম ছাহেবের মাজার আছে।

(৪) পরগণা রেঙ্গা দাউদপুর গ্রামে দাউদ কোরাএশি মরহুম ছাহেবের মাজার আছে। ইনি শাহ জালাল ছাহেবের সহচর ছিলেন।

(৫) রাজনগর থানার অধীনে সাগর দিঘীর পশ্চিম পাড়ে কোতবদ্দিন আওলিয়ার মাজার আছে। তিনি সাগরদিঘীর নিকট দিয়া পাল্কীর উপর আরোহন করিয়া যাইতেছিলেন, তথাকার রাজা শুবিদ নারায়ণ পাল্কী চড়িয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া বরকন্দাজ দিগকে তাঁহাকে লাঠি, শড়কী দ্বারা মারিতে পাঠাইয়া দেয় ও বেহারাদিগকে তাঁহার পাল্কী বহন করিতে নিষেধ করিয়া দেয়। পীর ছাহেব বেহারাদিগকে পাল্কী ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন,

ইহাতে পাল্‌কী শূন্যমার্গে চলিতে থাকে, রাজা মরিয়া যায়, তাহার চারি পুত্র মুসলমান হইয়া যায়, তাঁহাদের মুসলমানি নাম হাজি খাঁন, ইছা খাঁন, জামাল খাঁন কামাল খাঁন। রাজার দুই ভাই বানুগাছে গিয়া হিন্দু অবস্থায় বসবাস করিতেছে। যাহারা পীর সাহেবকে মারিতে গিয়াছিল, তাহারা ঐ কারামত দেখিয়া মুছলমান হইয়া যায়।

তাঁহার পুত্রও কামেল ছিলেন। একজন লোক পীর ছাহেবকে পাকা কলা দিতে আসিতেছিল, সেই পুত্র উহা চাহিয়াছিল, সে ব্যক্তি উহা তাঁহাকে দিতে অস্বীকার করে। ইহাতে তিনি বলেন, আচ্ছা লইয়া যাও। সে ব্যক্তি পীর সাহেবের নিকট উহা লইয়া গিয়া দেখিতে পাইল যে, উহা কাঁচা হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিতে লাগিল, হুজুর আমি পাকা কলা আনিয়াছিলাম, ইহা কাঁচা হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, পথে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া ছিল কি? সে, বলিল, হাঁ একটী বালকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, বালকটী উহা খাইতে চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। পীর ছাহেব বলিলেন, ইহা তাহার নিকট দিয়া আইস, তথায় গেলে দেখিতে পায় যে, উহা পাকা হইয়া গিয়াছে।

(৬) শ্রীহট্ট হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বদিকে ও করিমগঞ্জ হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমদিকে চারখাই গ্রামে দুই জন অলীর মাজার আছে।

(৭) নায়ার কান্দি ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল উত্তরে প্রতাবগড়ে ১ জন অলীর মাজার আছে।

(৮) টাউনের মধ্যে কাজির বাজারে ৩ জন অলীর মাজার আছে।

(৯) ফৌজদারি আদালতের উত্তর দিকে জেন্দাবাজারে জেন্দা পীর ও অন্যান্য ৫ জন অলীর মাজার আছে।

(১০) রেকাবি বাজারে পীর শাহ ও মধুসুদন এই দুই জন বোজর্গের মাজার আছে।

(১১) এইস্থলে একজন সৈয়দ ছাহেব উপস্থিত হন, তথাকার যোগীরা তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া তাঁহার কল্লা কাটিয়া ফেলে, তিনি মস্তক হীন অবস্থায় অনেক যোগীকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে শহীদ হইয়া যান, তাঁহার মস্তক ময়দানের উত্তর দিকে ও ধড় দক্ষিণ দিকে দফন করা হইয়াছে। ইনি কল্লা সহিদ পীর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

(১২) শ্রীহট্ট জেলার শাএস্তা গঞ্জ ষ্টেশনের তরফ পরগণাতে হজরত কোতবোল আওলিয়া ছাহেবের মাজার আছে।

শাহ মোম্মদুল্লা, শাহ মুজিবুল্লাহ প্রভৃতি, হজরত শাহ নছিরদ্দিন, হজরত শাহ ছেরাজদ্দিন, শাহ খোদাওন্দ, শাহ হাছান আলি, শাহ দাউদ, শাহ বড়া মিএা, সৈয়দ আরেজ, হজরত শাহ এছরাইল, হজরত শাহ ছাএফ প্রভৃতি। কোতবোল আওলিয়ার ভাই শাহ এলাছ ওরফে কাজি খোন্দকার, কোতবোল আওলিয়ার বিবি, তাঁহার তিন জন মুরিদা, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ তির, সৈয়দ মোহাম্মদ ওয়াতির ছাহেবগণের মাজার আছে।

(১৩) বদরপুর ষ্টেশনের নিকট দেওরাইল গ্রামে শাহ বদরুদ্দিন ছাহেবের মাজার আছে। ইনি হজরত শাহ জালাল এমনি ছাহেবের সহচর ছিলেন।

(১৪) তথায় শাহ আবদুল মজিদ ছাহেবের মাজার আছে, ইনিও উক্ত হজরত সাহেবের সহচর ছিলেন।

(১৫) চরগোলা ষ্টেশনের ৫ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে এগরসর্ত্তি গ্রামে শাহ মোনাওয়ার ওরফে মোনাই শাহ ছাহেবের মাজার আছে।

(১৬) বদরপুর স্টেশনের নিকট জইন্তা গ্রামে শাহ কেয়ামদ্দিন

সাহেব, শাহ আদম খাকি ও শাহ সেকেন্দর গাজি সাহেবের মাজার আছে। প্রথম মাজারটি নদীসাৎ হইয়াছে। তৃতীয় হজরত শাহ জালাল সাহেবের ভাগিনেয় ছিলেন। ইহারা তিন জন তাঁহার সহচর ছিলেন।

(১৭) ভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে খোলা গ্রামে শাহ আম্বার সাহেবের মাজার আছে।

(১৮) ভাঙ্গা ষ্টেশনের দেড় মাইল পূর্ব্ব-উত্তর দিকে মালুয়া গ্রামে হাজি শাহ শাক্কার সাহেবের মাজার আছে ইনি হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর ছিলেন।

(১৯) ভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে সাড়ে তিন মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে গঙ্গাজল গ্রামে শাহ জাহান সাহেবের মাজার আছে, ইনি হজরত শাহ জালাল সাহেবের পরে আসিয়াছিলেন।

(২০) ভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তর পশ্চিমে নদীর উত্তর পারে শরিফগঞ্জ গ্রামে হজরত শাহ শরফ সাহেবের মাজার আছে, ইনি হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর ছিলেন।

(২১) বদরপুর মাদ্রাসাতে হজরত আবোন শাহ, কুট্রি শাহ, কালা শাহ এই ৩ জন মজযুবের মাজার আছে, তাঁহারা হজরত শাহ জালালের পরের লোক ছিলেন।

(২২) করিমগঞ্জ ষ্টেশনের সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে কর্ণমধু গ্রামে পীর মল্লিক ও হজরত ওমার চিশতী ছাহেবদ্বয়ের মাজার আছে। ইহারা হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর ছিলেন। তথায় হজরত সৈয়দ আহমদ মাদানি, হজরত কালা শাহ ও মুরাদ শাহ সাহেবের মাজার আছে। ইঁহারা তিন জন হজরত শাহজালাল সাহেবের পরে আসিয়াছিলেন। হজরত কালা শাহ মজযুব ছিলেন।

(২৩) ভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ১ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে খাতাই শাহ ও ডোঙ্গা শাহ এই দুই মজযুবের মজার আছে; ইহারা

হজরত শাহ জালাল সাহেবের পরের জামানার লোক ছিলেন।

(২৪) বদরপুর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে গড় কঁপন গ্রামে শেখ ফরিদ রওশন চেরাগ সাহেবের মাজার আছে, ইনি হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর নহেন।

(২৫) ভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে বারটাকুরি গ্রামে শেতালঙ্গ শাহ (বা সলিমোল্লাহ শাহ) নামক একজন পীরের মাজার আছে, ইন হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর নহেন।

(২৬) বিস্কুট গ্রামে শাহ ছুফি আবদুল্লাহ সাহেবের মাজার আছে।

(২৭) করিকগঞ্জ ষ্টেশনের ১৫ মাইল পশ্চিমে গোর্দ্দাগ্রামে খাজা আদিনা ছুফি ও সৈয়দ কোতবদ্দিন সাহেবের মাজার আছে।

(২৮) সৈয়দ কতবা গ্রামে সৈয়দ কোতব ও সৈয়দ বাবু সাহেবের মাজার আছে।

(২৯) শুছা গ্রামে সৈয়দ উড়াওন সাহেবের মাজার আছে।

(৩০) দেল গ্রামে শেরবাজ শাহ সাহেবের মাজার আছে। ইহারা হজরত শাহ জালাল সাহেবের সহচর ছিলেন। তথায় আশরাফ আলি শাহ সাহেবের মাজার আছে, ইনি তাঁহার সহচর ছিলেন না।

(৩১) ভাঙ্গা ষ্টেশনের তিন পোয়া মাইল পশ্চিমে পিল্লাকান্দি গ্রামে শাহ শরিফ সাহেবের মাজার আছে, তাঁহার নামেই শরিফগঞ্জ বাজার নামকরণ করা হইয়াছে।

(৩২) শ্রীহট্ট টাউনের ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে দক্ষিণে গাচ গ্রামে হজরত শাহ পীরান সাহেবের মাজার আছে।

(৩৩) শ্রীহট্ট টাউনের ৩ মাইল দক্ষিণে সিলামপুর গ্রামে

হজরত শাহ তইয়েব সায়লানি সাহেবের দরগা আছে।

(৩৪) শ্রীহট্ট হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে দাউদপুর গ্রামে হজরত শাহ দাউদ কোরায়শির মাজার আছে।

(৩৫) শ্রীহট্টের ৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে গায়বীর মকামে হজরত সৈয়দ মা'ছুম সাহেবের বৈঠকস্থান আছে। কথিত আছে, তথায় একটী দুষ্ট দৈত্য ছিল, হজরত শাহ জালাল ছাহেব উক্ত দুষ্ট জ্বেনকে বিতাড়িত করার জন্য হজরত সৈয়দ মা'ছুম ছাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নদীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার ও দুষ্ট জ্বেনের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় তিনি জ্বেন কর্ত্তৃক নদীসাৎ হইয়াছিলেন, আর জ্বেনটী তাঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।

(৩৬) ভাঙ্গা ষ্টেশনের দেড় মাইল পূর্ব্ব দিকে দরগা বাজারে হজরত কোতবদ্দিন সাহেবের মাজার আছে।

(৩৭) শ্রীহট্ট টাউনের ৫ মাইল দক্ষিণে জালালপুর গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে।

(৩৮) উক্ত টাউনের ১৫ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে শারপাড়া গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে।

(৩৯) শ্রীহট্ট টাউনের ৯ মাইল পূর্ব্বদিকে ফুলবাড়ী গ্রামে খলফু মিঞা ও অন্যান্য অনেক প্রাচীন অলির মাজার আছে।

(৪০) হজরত মানিক পীর সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীয় ছোট পীর সাহেবের মাজার কসবা শ্রীহট্টের মানিক পীর টীলার চূড়ায় অবস্থিত।

(৪১) হজরত কামালদ্দিন সাহেবের মাজার পরগণা চৌয়াল্লিশ মৌজে কামালপুরে আছে।

(৪২) টাউনের ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে পরগণা দক্ষিণগাছে শাহ পরাণ সাহেবের মাজার আছে।

(৪৩) টাউনে গবর্ণমেন্ট হাই স্কুলের সম্মুখস্থ পাক্কা মসজিদের উত্তরে শাহ্ চট সাহেবের মাজার আছে।

(৪৪) হজরত খাজা আদিনা সাহেবের মাজার কসবা—শ্রীহট্টের মৌজা খাস্তদবিরের উত্তরে ১২০ গুম্বজ বিশিষ্ট মছজেদের ভগ্নাবশেষের নিকটে অবস্থিত।

(৪৫) হজরত শেখ খেজের খাস্তদবির সাহেবের মাজার শ্রীহট্ট কসবার খাস্তদবির নামক স্থানে অবস্থিত।

(৪৬) হজরত শাহ আবু তোরাব সাহেবের দরগা চকের মছজেদের সংলগ্ন স্থানে আছে।

(৪৭) হজরত মখদুম সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীয় ৩ জন দরবেশের দরগা টাউনের দপ্তরি পাড়ায় আছে।

(৪৮) হজরত খিজির ছুফি সাহেব ও শাহ সজ্জুর সাহেবের দরগা টাউনের বারুতখানায় আছে।

(৪৯) তথায় হজরত বাগদার আলী সাহারা দরগা আছে।

(৫০) হজরত শাহ সুনদার সাহেবের দরগা দক্ষিণগাছে আছে।

(৫১) হজরত শাহ মদন সাহেবের দরগা টিলাগড় নামক স্থানে আছে।

(৫২) হজরত শাহ এতিম সাহেবের মাজার বাদল লটকা নামক স্থানে আছে।

(৫৩) হজরত গরম দেওয়ান সাহেবের মাজার মিরাবাজারের দক্ষিণে কুলিয়া পাড়াতে আছে।

(৫৪) হজরত দাদা পীর সাহেবের মাজার টাউনের মৌজা মোকতার খাকি—বর্ত্তমান রিচি সাহেবের বাঙ্গলার সম্মুখে আছে।

(৫৫) হজরত সৈয়দ ওমর ছমরকান্দি সাহেবের দরগা ধুপা দীঘির পূর্ব্ব পারে আছে।

(৫৬) হজরত হাজি গাজি ছাহেবের মাজার ঈদগার ময়দানের পূর্ব্বে আছে।

(৫৭) হজরত মোক্তার সহিদ ছাহেবের মাজার মোক্তার শহিদ নামক স্থানে আছে।

(৫৮) হজরত হোছাএন মহিদ সাহেবের মাজার টাউনের হুছায়েন মহিদ নামক স্থানে আছে।

(৫৯) হজরত কাজি জালালুদ্দিন সাহেবের মাজার কাজিটুলাতে আছে।

(৬০) হজরত কাজি গয়লা সাহেবের মাজার উক্ত কাজিটুলীতে আছে।

(৬১) হজরত দেওয়ান ফতেহ মহম্মদ ও শেখ করম মোহম্মদ সাহেবদ্বয়ের মাজার শেখঘাটে আছে।

(৬২) হজরত জিয়াউদ্দিন সাহেবের মাজারপীরে গঞ্জেতন নামক স্থানে আছে। তথায় আরও চারিজন পীরের মাজার আছে।

(৬৩) হজরত সৈয়দ লান ও হিঙ্গালাল সাহেবদ্বয়ের মাজার সওদাগর টোলায় আছে। তথায় হাজি চাঁদ খার মাজার আছে।

(৬৪) বন্দর বাজারে সাহনুর ও অপর দুইজন বোজর্গের মাজার আছে।

(৬৫) কুয়ারপারে সৈয়দ লাল ও সৈয়দ জাহাঁ সাহেবদ্বয়ের মাজার আছে।

(৬৬) গোয়াই পাড়ায় চাসনি পীর ও শেখ জখাই পীরের মাজার আছে।

(৬৭) জল্লার পারে গোলাম হজরত সাহেব ও আমিন সাহেবের মাজার আছে।

(৬৮) হজরত শাহকামাল সাহেবের মাজার সাহারপাড় গামের আছে।

(৬৯) হজরত শাহ চাঁদ সাহেবের মাজার চাঙ্গতরাঙ্গ নামক স্থানে আছে।

(৭০) হজরত শাহ হেলিমদ্দিন সাহেবের মাজার কানিহাটী নামক স্থানে আছে।

(৭১) হজরত শাহ কালু সাহেবের মাজার পীরের গ্রামে আছে।

(৭২) হজরত শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের মাজার সারপিং গ্রামে আছে।

(৭৩) হজরত সৈয়দ মহবত ও সাহমালম সাহেবদ্বয়ের মাজার পরগণা মৌরাপুরে আছে।

(৭৪) হজরত শাহ ফরঙ্গ সাহেবের মাজার মৌলবিবাজার এলাকায় মনুমুখ নামক স্থানে আছে।

(৭৫) হজরত শাহ ছদর উদ্দিন সাহেবের মজার পরগণা বাজে ছয়সুতী মৌজে পর্ব্বতপুরে আছে।

(৭৬) হজরত সৈয়দ আবুবকর সাহেবের মাজার কমিগঞ্জের এলাকায় ছোটলেখা নামক স্থানে আছে।

(৭৭) হজরত তাজদ্দিন সাহেবের মাজার পরগণা আরঙ্গ পুরে তাজপুর গ্রামে আছে।

(৭৮) হজরত ফতেহ গাজি সাহেবের মাজার পরগণা তরফের ফতেপুরে আছে।

(৭৯) হজরত জিয়াউদ্দিন সাহেবের মাজার পরগণা চাপঘাটের বন্দাছল গ্রামে আছে।

(৮০) হজরত শাহ সামসুদ্দিন সাহেবের মাজার মৌজা সৈয়দপুরে আছে।

(৮১) হজরত শাহ সিকিন্দর মাং সাহেবের মাজার পরগণা ছলখাইড়ের শাহ সিকন্দর নামক গ্রামে আছে।

(৮২) হজরত ব-আবু-দৌলত সাহেবের মাজার উক্ত পরগণার বিবি দৌলত নামক স্থানে আছে।

(৮৩) তৈয়ব সালামির মাজার পরগণা গোধরালীর সিলাম প্রকাশ্য চকের বাজারে আছে।

(৮৪) শ্রীহট্ট টাউনের ৫ মাইল পশ্চিমে খর্রুম খোলাতে পীর খোর্রুম শাহের মাজার আছে।

(৮৫) উহার ১৫ মাইল দক্ষিণে বোয়ানজুর বাজের দেষরাতে একজন পীরের মাজার আছে।

(৮৬) ফেঞ্চুগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে মানিক পীর সাহেবের মাজার আছে।

(৮৭) গোলবগঞ্জ ষ্টিমার ষ্টেশনের নিকট বেলা শাহ ও মুছাই শাহ এই দুই বোজর্গের মাজার আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি মজযুব ছিলেন, ১৩০৫ সনে এন্তেকাল করেন, শেষোক্ত ব্যক্তি ১৩১১ কিম্বা ১২ সনে এন্তেকাল করেন।

(৮৮) উহার ৩ মাইল পশ্চিমে মজিদপুরে উজির শাহ নামক মজযুব ফকিরের মাজার আছে, ইনি ১৩০৪ সনে এন্তেকাল করেন।

(৮৯) উহার ৩ মাইল দক্ষিণে মছফাপুরে হাজি আবদুল্লাহ

নামক বোজর্গের মাজার আছে, ইনি ১৩২২ সনে এন্তেকাল করেন।

(৯০) মুফতি বাজারের ১ মাইল পশ্চিম উত্তরে খাজানশি গাঁওতে আছির শাহ নামক মজযুবের মাজার আছে, ইনি ১৩৩৪ সনে এন্তেকাল করিয়াছেন।

(৯১) গৌহাটী হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে হাজু পাহাড়ে শাহ গেয়াসুদ্দিন সাহেবের মাজার আছে, ইনি শাহ জালাল সাহেবের সহচর ছিলেন। কামাখ্যার রাজা তাঁহার জন্য ৯ হাজার টাকার জাএদাদ দান করিয়াছিলেন।

(৯২) ছিঙ্গার কাছে পীর রমাই শাহ সাহেবের মাজার আছে।

(৯৩) ফুলবাড়ির ১ মাইল দুরে রলিকাইল গ্রামে পীর আহমদ আলি সাহেবের মাজার আছে।

(৯৪) জইন্তা পাহাড়ের ১২/১৪ মাইল দক্ষিণে কানাই ঘাটে জগন শাহ সাহেবের মাজার আছে।

(৯৫) পাতারিয়ার পাহাড়ে সৈয়দ জানি সাহেবের মাজার আছে।

(৯৬) লাউড়ী পাহাড়ে শাহ আরেফিন ছাহেবের মাজার আছে, কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার মাজার আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

পঞ্চম অধ্যায়

ঢাকা

(১) ঢাকা হইতে ৬ মাইল পশ্চিম দিকে মিরপুরে হজরত

সুলতানোল আওলিয়া শাহ আলি সাহেবরে মাজার আছে, তাঁহার মাজার একটী গুম্বজের মধ্যে আছে, বাদশাহরা দুই বার তাঁহার গুম্বজ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তৃতীয় বার নওয়াব নোছরাতোল মোলক উহা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বহুলোক তাঁহার জিয়াতের জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইনি শ্রীহট্টের শাহ জালাল ইমনি সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন।

(২) সোনারগাঁওতে সুলতান গোয়াছদ্দিন সাহেবের মাজার আছে, তাঁহাকে কালা পীর নামে অভিহিত করা হয়। তথায় হজরত এবরাহিম বলখি ও তাঁহার পুত্র ইউছোফ বলখির মাজার আছে। তথায় লঙ্গর শাহ সাহেবের মাজার আছে। তথায় হজরত আফজল খোন্দকার সাহেবের মাজার আছে। উহার ১০০ হাত পশ্চিমে পাঁচ পীরের দরগা আছে।

(৩) ঢাকা শহরে নওয়াব লালবাগের উত্তর পশ্চিমে আজমপুরে ছুফি শাহ মোহম্মদ দাএম সাহেব, শাহ অলিউল্লাহ সাহেব, তাঁহার বিবি, ছুফি শাহ রওশন আলি সাহেব, শাহ আহমদুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা শাহ লকিতুল্লাহ সাহেবের মাজার আছে। তথায় শাহ হাফিজুল্লাহ শাহ সাহেবের ও শাহ খলিলোর রহমান সাহেবের মাজার আছে। একজন পর্য্যটক বলিয়াছেন। তথায় ছুফি শাহ জাহানির মাজার আছে।

সুফি দাএম সাহেব চটগ্রামের শাহ আমানাত সাহেবের মুরিদ ছিলেন। সুফি রওশন আলি সাহেব সুফি দাএম সাহেবের খলিফা ছিলেন। হজরত চাচা পীর মাওলানা মোহম্মদ এফরামোল হক সাহেব বলিয়াছেন, আমি ১২১৯ সনে আজমপুর দাএরাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময় উক্ত দাএরার গদ্দিনশিন শাহ খলিলোর রহমান সাহেব ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের এই দাএরা হইতে সুফি নুর মোহম্মদ সাহেব ও সুফি রহমতুল্লাহ এই সাহেবদ্বয়ের

ন্যায় মস্ত ফয়েজ ইয়াব কোন খলিফাবাহির হয় নাই। এই দুই জন সুফি রওশন আলি সাহেবের খলিফা ছিলেন। এক সময় একজন হিন্দু রাধা কানাই বলিয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল, তৎশ্রবণে উক্ত সুফি সাহেব বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ ? সে বলিল, আমি আমাদের একজন দেবতার নাম জপনা করিতেছি— যিনি একরাত্রে ১৬ শত গোপিনীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করিতেন, ইহা কতবড় অলৌকিক শক্তি ? সুফি সাহেব বলিলেন, ইহাতে কি লোক কামেল হয় ? যদি কেহ এইরূপ কার্য্য করিতে পারে, তবে তুমি তাহাকে মানিবে ? সেই হিন্দু বলিল, হাঁ মানিব। তিনি বলিলেন, তুমি এই গাছের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সে গাছের প্রত্যেক পত্রে সুফি সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া মুছলমান হইয়া তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া গেল।

সুফি নুর মোহম্মদ চট্টগ্রামি সাহেব তথায় কামেল হইয়া যান, যে সময় হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় হজরত নবি (সাঃ) সুফি নূর মোহম্মদ সাহেবকে স্বপ্ন যোগে বলেন, হে নুর মোহম্মদ, আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। তিন বার হজরত এইরূপ আদেশ করিলে, ইনি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া খেলাফত লাভ করেন এবং হজরত সৈয়দ সাহেবের শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার খেদমতে থাকেন। এই হজরতের মাজার নেজামপুরের মলিয়াছ পল্লিতে আছে। সুফি রহমতুল্লাহ সাহেবের মাজার মোর্শেদাবাদের রৌশনবাগে আছে।

এক সময় হজরত সুফি ফতেহ আলি সাহেব সুফি রওশন আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, তোমার নাম কি? ইনি বলেন, আমার নাম ফতেহ আলি। তৎশ্রবণে তিনি বলেন, তোমার বড় ফতেহ অসিতেছে।

(৪) ঢাকা রমনা ফিল্‌ডে আবদুল্লাহ্ শাহ্ কালান্দার ওরফে কিস্তি শাহ্ সাহেবের মাজার আছে। ইহা একজন পরিব্রাজকের বর্ণনা।

(৫) ডাক্তার শহিদুল্লাহ সাহেব বলেন, আমি যে কোয়ার্টারে থাকি, ইহার গেটের নিকট প্রাচীরের মধ্যে তারু মারু নামক দুইজন বোজর্গের মাজার আছে।

(৬) ঢাকা টাউনে চকবাজারের মছজেদেরে উত্তর প্রাঙ্গনে মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরি ছাহেবের মাজার আছে। ইনি জৌনপুরী মাওলানা কেরামত আলি ছাহেবের প্রথম পুত্র ছিলেন, ইনি চাল চলনে, নেছাব পোষাকে পরহেজগারিতে নিজের ওয়ালেদ ছাহেবের নমুনা ছিলেন, তাঁহার ওয়ালেদ সাহেবের এন্তেকালের পর খলিফাস্বরূপ নওয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশাল ঢাকা ইত্যাদি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হেদাএত করিয়া বেড়াইতেন, বহু লোক তাঁহার পাক হস্তে মুরিদ হইয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা হাফেজ আবদুর রব সাহেবকে সযত্নে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চরপাতার কলিম মিঞা বলিয়াছেন, আমি অনেক দিবস তাঁহার খেদমতে ছিলাম। এক দিবস শৃগালে তাঁহার একটী মোরগ লইয়া গিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, শৃগালে ইহা খাইতে পারিবে না। লোকেরা সন্ধান করিবার পর দেখিতে পাইল যে, শৃগালে মোরগটীকে জীবিতাবস্থায় কোলে লইয়া বসিয়া আছে, উহা খাইতে পারে নাই, পরে তাহারা মোরগটী কাড়িয়া লইয়া আসে।

হাফেজ মাওলানা আহমদ সাহেব ঢাকার কোন স্থানে পাল্‌কীতে যাইতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে একটী স্ত্রীলোক গরু বাঁধিতেছে। তিনি অনিমিষ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সঙ্গী একজন মৌলবী সাহেব হাফেজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন পীর, অলী মৌলানা, মৌলবি ও হাফেজ সাহেবের পক্ষে বেগানা স্ত্রীলোকের দিকে তাকাইয়া থাকা জায়েজ হইবে কি ? তিনি

বলিলেন, না। পর দিবস সেই স্ত্রীলোকটির লাশ জানাজার জন্য আনা হইল। নামাজ অন্তে হাফেজ সাহেব বলিলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা গরুর শৃঙ্গের উপর বসিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের প্রাণ বাহির করার চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাহাই অনিমিষ নেত্রে দেখিতে ছিলাম।

জনাব হাফেজ সাহেব ত্রিপুরার মতলব থানার অধীনে প্রচার কার্য্য করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। চাঁদপুরের এলাকার একজন ডাক্তারকে আনা হয়, তিনি তাঁহার অবস্থা মন্দ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া যাওয়ার পরামর্শ দেন। পথিমধ্যে বোটে হাফেজ সাহেব এন্তেকাল করেন। তাঁহার দফন কোথায় হইবে, ইহা লইয়া ঢাকার নবাব সাহেব ও অন্য আর এক দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেকেই নিজের অধিকার ভুক্ত স্থানে তাঁহাকে দফন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অবশেষে চকবাজারের মসজেদের দক্ষিণ পার্শ্বে দফন করা হয়। মৃত্যুকালে মাওলানা আবদুল আউওল সাহেব কিম্বা মাওলানা আবদুর রব সাহেব তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন না, ইহা অনেক লোকের বর্ণনা।

(৭) ঢাকা জেলার রামপাল গ্রামে হজরত বাবা আদমের দরগা আছে বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। ইনি একজন হিন্দু রাজার সহিত জেহাদ করিতে করিতে শহীদ হন। কথিত আছে, জেহাদ কালে আছরের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া নামাজ পড়িতে থাকেন। তখন তাঁহার শত্রু তাঁহার ছেজদার অবস্থায় গর্দ্দানে তরবারি মারে, নামাজ শেষ করিয়া তিনি হাঁসিয়া বলিলেন, তোমার তরবারিতে আমি মরিব না। তখন শত্রু তাঁহার সহিত আলাপ করিতে থাকে। কথা প্রসঙ্গে শত্রু জিজ্ঞাসা করে আপনি কি প্রকারে মরিবেন? হজরত শাহ সাহেব তাঁহার কোমরে এক খানা অসি দেখাইয়া বলিলেন যে, এই অসি ব্যতীত অন্য কিছুতেই মরিব না। মগরেবের নামাজের ওয়াক্তে শাহ সাহেব

নামাজ পড়িতে ছিলেন, শত্রু হঠাৎ সেই তরবারি টানিয়া লইয়া আঘাত করায় তিনি শহীদ হন। সেই অবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, ইহাতে তোমার বংশ থাকিবে না। রাজা বাটী যাইয়া দেখে, তাহার পুত্র পরিজন সমস্তই মরিয়া গিয়াছে। রাজা ইহা দর্শনে ঘোড়াসহ রামসাগর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিয়া যায়।

(৮) ঢাকা টাউনের পূর্ব্ব পার্শ্বে নারেন্দা গ্রামে হজরত শাহ আহছানুল্লাহ সাহেবের দরগা আছে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বসতি দিল্লীতে ছিল। তাঁহারা প্রথমে সোনারগাঁও শহরে বাসস্থান স্থির করেন, পরে তাঁহার পিতা ও চাচা মেঘনা নদীর ভাঙ্গনের জন্য মশুরিখোলাতে বাসস্থান স্থির করেন। শাহ সাহেব ১২১১ সনে ভাদ্র মাসে বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নুর মিয়াজি, তাঁহার দাদার নাম মোল্লা রফিউদ্দিন ও পর-দাদার নাম তাজ মোহম্মদ মোল্লা। তিনি ঢাকার কোন মাদ্রাসায় এলম শিক্ষা করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার সম্পর্কীয় নানা পীর মোহাম্মদ সাহেবের নিকট চিস্তিয়া তরিকার জেকর শিক্ষা করেন, তৎপরে তিনি হজরত মাওলানা এমামদ্দিন সুধারামি সাহেব ঢাকা হেদায়েত করিতে আসেন, সেই সময় শাহ সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নেক দোয়া লাভ করেন। তৎপরে তিনি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দোয়া হাসেল করেন। তৎপরে তিনি সৈয়দ কলিম শাহ বাগদাদীর নিকট কাদেরিয়া তরিকায় মুরিদ হইয়া জেকর আজকারে মশগুল হন, তিনি এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন যে, তোমার কার্য্য সোণারগাঁওতে সমাপ্ত হইবে। তৎপরে তিনি সোনারগাঁওতে উপস্থিত হইয়া খাজা শাহ লস্কর মোল্লার নিকট চিস্তিয়া তরিকায় মুরিদ হন। ইনি খাজা শাহ গোলজার সাহেবের খলিফা ছিলেন, ইনি হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদ সাহেবের খলিফা ছিলেন, হজরত শাহ কলিম কাশফ

শক্তি সম্পন্ন পীর ছিলেন। এক সময় তাঁহার একজন মুরিদ কিছু চাউল তাঁহাকে উপঢৌকন দিতে আনিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার অদ্যকার চাউল আমি লইব না, অন্য দিবস উহা আনিলে লইব, মুরিদ বাটীতে গিয়া তদন্ত করিয়া বুঝিল, কোন স্ত্রীলোক উক্ত চাউল হায়েজ অবস্থায় প্রস্তুত করিয়াছিল।

একসময় তাঁহার একজন মুরিদ তাঁহার জন্য দুগ্ধ আনিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বাবা, তুমি এই দুগ্ধ ফিরিইয়া লইয়া তোমার মাতাকে দাও। তাহার মাতা বলিয়াছিল, এই দুগ্ধ পিষ্টকের সহিত খাইতে হইবে, লইয়া যাইওনা; কিন্তু মুরিদ মাতার কথা অমান্য করিয়া উহা পীরের জন্য আনিয়াছিল, এই হেতু শাহ সাহেব উহা বলিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার অনেক কারামতের কথা অখলাকে আহ্‌ছানিয়া কেতাবে লিখিত হইয়াছে। শাহ আহ্ছানউল্লাহ সাহেব অতি পরহেজগার, কাশফশক্তি সম্পন্ন কারামত বিশিষ্ট দরবেশ ছিলেন, তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ আখলাকে-আহ্‌ছানিয়া কেতাবে দেখুন।

(৯) ঢাকার ধামরাই নগরে হজরত মীর সৈয়দ আলী তাব্রেজী সাহেবের মাজার আছে, তিনি বাবা আদমের এন্তেকালের পরে ঢাকাতে বহু অনুচর সহ আগমন করিয়াছিলেন।

(১০) শীতালক্ষা নদীর পারে হাজিগঞ্জ গ্রামে হাফেজ মাওলানা হুরেরমান সাহেবের পোক্তা মাজার আছে।

(১১) বিক্রমপুরের অধীন সৈয়দপুর গ্রামে সৈয়দ শাহে-মুর ছাহেবের মাজার আছে। তথায় রঘুরাম নামক একজন হিন্দু রাজা ছিল, সে মুছলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। সৈয়দ শাহে-মুর শিষ্যগণ সহ উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করেন, ৭ দিবস পরে রাজা বন্দী হইয়া পড়েন, অবশেষে রাজা হীরকের অঙ্গুরী চুষিয়া আত্মহত্যা করে, তাহার পরিজনগণ অগ্নিতে পুড়িয়া নিহত হয়। হজরত সৈয়দ

ছাহেব ৭৩২ হিজরীতে মক্কা-শরিফ হইতে এদেশে আগমন করেন, ৫০ বৎসর হেদাএত করিয়া ৭৮৩ হিজরীতে সৈয়দ মহ-ইউদ্দিন নামক এক পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

(১২) সোনাকান্দা গ্রামে সৈয়দ শাহ আলি বন্দর ছাহেবের মজার আছে, ইনি মক্কা শরিফ শইতে হিন্দুস্তানে ইছলাম প্রচারের জন্য আগমণ করিয়াছিলেন। তথায় একটী মছজেদ আছে, উহার শিলা লিপিতে লিখিত আছে, ইহা ৬৮০ হিজরীতে শাহ মোজাফফর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১৩) কাজি কসবাতে সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ সাহেবের মজার আছে, তিনি সোনারগাঁর মোল্লা পাড়া কিছমত কাজি কশবা ২৮০ বিঘা জমি ৯২৯ হিজরীতে লাখেরাজ পাইয়াছিলেন।

(১৪) নারায়ণগঞ্জের উত্তর দিকে নলখালী খালের পোলের পশ্চিম দিকে করিম শাহ ছাহেবের একটী পোক্তা প্রাচীর বেস্টিত মজার আছে। ইনি বগ্দাদ শরিফ হইতে বাঙ্গালা ১১২৯ সনে এদেশে আসিয়াছিলেন।

(১৫) ঢাকা টাউনে বাবুর বাজারে বাহার শাহ সাহেবের মজার আছে, ইনি ১৯২৪ সালে এন্তেকাল করেন। তথায় জোম্মোন শাহ সাহেবের মজার আছে। ইনি পুরাতন কালের পীর ছিলেন।

(১৬) মগ বাজারে একজন পীরের মজার আছে, তহার যমজ পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের কতক কারামতের কথা শুনা যায়।

(১৭) পুরাতন পলটনে গোলাব শাহ ও মালেক শাহ এই দুই বোজর্গের কবর আছে।

(১৮) লোহার পোলের নিকট নওয়াব আলি শাহ সাহেবের মাজার আছে।

(১৯) পীর জঙ্গলী নামক স্থানে জঙ্গলী পীর ছাহেবের মাজার আছে।

ময়মনসিংহ

(১) ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার আটিয়া গ্রামে হজরত বাবা শাহ আদম কাশমিরি (কোঃ)র মাজার আছে। ইনি অতিরিক্ত তেজ ও জ্বালানি ফয়েজের অলি ছিলেন, সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছইদ খাঁ পনির সহিত আটিয়া ও শেরপুরের ইছলামদ্রোহী হিন্দু রাজাদিগকে দমন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ছইদ খাঁ পনি এই সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাদশাহর পক্ষ হইতে আটিয়া পরগণা জায়গির রূপে প্রাপ্ত হন, সেই সময় তিনি ঐ জায়গিরের এক চতুর্থাংশ হজরত বাবাকে প্রদান করেন। হজরত বাবা তাহা প্রজাদিগকে দান করেন, অদ্যবধি আটিয়া পরগণার সমস্ত প্রজারা এই সুবিধা ভোগ করিতেছেন— অর্থাৎ এক পাকি জমির যে, খাজনা, তাহার একচতুর্থাংশ প্রজারা মাফ পাইয়া থাকেন। তাঁহার বহু কারামতের প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহার মাজারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে স্থানীয় জমিদারেরা ১৪ খানা গ্রাম অকফ করিয়া দিয়াছিলেন, অদ্যবধি এই অকফ বিদ্যমান আছে। হজরত বাবার সময়ের অনেক কীর্ত্তি এখানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) ময়মনসিংহের দুরমুট নামক স্থানে যে শাহ কামাল ছাহেবের মাজার আছে, তাঁহার ইতিহাস লোক পরম্পরায় শুনা যায় যে, আসামের কামাখ্যা পাহাড়ের একটা রাক্ষসী রংপুর ও ময়মনসিংহের সঙ্গমস্থল চিলমারির নিকটস্থ পাহাড়ে আগমণ করিয়া মানব বংশের ধ্বংস সাধন করিত, এইহেতু লোকেরা সর্ব্বদা এই

উপদ্রবের জন্য বিব্রত থাকিত, লোকদিগকে কাষ্ঠ আহরণের জন্য পাহাড়ে যাইতেই হইত, অনেক সময় তাহারা ঐ রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। অবশেষে তাহাদের ও রাক্ষসীর মধ্যে একটি শর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল, শর্ত্তটী এই যে, বৎসরের মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে রাক্ষসীকে এক একটী মানুষ উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইবে। কোন্ দিবসে কোন্ বাটীর লোককে উহার জন্য উৎসর্গ করা হইবে, ইহা দেশের সমিতি দ্বারা স্থিরিকৃত করা হইবে। এক দিবস পশ্চিম দেশ হইতে শাহ্ কামাল নামে একজন জবরদস্ত কামেল দরবেশ সেই স্থানে এক গৃহস্থের বাটীতে অতিথি রূপে আগমণ করিলেন। গৃহের লোকেরা ক্রন্দন করিতেছিল, দরবেশ সাহেব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা পরিচয় দিতে গিয়া বলিল, আমাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে বৎসরের অমুক অমুক দিবসে এক একটী লোককে কামাখ্যার রাক্ষসীর জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়, কল্য আমাদের গৃহের একটি লোককে উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে, এই জন্য আমরা ক্রন্দন করিতেছি, হজরত শাহ্ কামাল ছাহেব বলিলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, আমাকেই তোমরা রাক্ষসীর কবলে ত্যাগ করিও। শাহ্ সাহেব পাহাড়ের উপর জায়নামাজ বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন, চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রাক্ষসী তথায় উপস্থিত হইয়া শাহ্ সাহেবকে দেখিয়াই পলায়ণ করার চেষ্টা করিল, কিন্তু শাহ্ সাহেব লাঠি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বহু দুরের এক পাহাড়ে এক পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তথায় উক্ত পীর ছাহেবের কদম শরিফের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে, ইহা কতক লোক দেখিয়া আসিয়াছে, তৎপরে পীর সাহেব উক্ত লাঠিখানা কামাখ্যা পাহাড়ে উক্ত রাক্ষসীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, রাক্ষসী পাথর আকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে, উক্ত কারিয়াাছিলেন, রাক্ষসী পাথর আকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে, উক্ত পাথরের উপর লাঠিখানা বিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, অনেক মুসলমান ইহা দেখিয়া আসিয়াছে, হিন্দুরা তথায় পূজা করিয়া থাকে।

(৩) ময়মনসিংহ হইতে ৮ মাইল উত্তরে বাগের পাড়া গ্রামে হজরত লাখু শাহা ছাহেবের মজার আছে, তিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছাইয়া নামাজ পড়িতেন, প্রায় ৬০ বৎসর হইল, তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।

(৪) দাদরাতে মেন্দু শাহ খোন্দকারের মজার আছে, কেহ তাঁহার মজার জিয়ারত করিলে, খোদা তাঁহার মনোবঞ্ছা পূর্ণ করেন।

(৫) দাদরা হইতে ২ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে কাকনিয়া গ্রামে মযজুব কাদের বখশ ছাহেবের মজার আছে, ইনি হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ছাহেবের মুরিদ। তাঁহার গোর জিয়ারতে খোদা রুগ্নদিগের রোগ আরাগ্য করেন।

(৬) নেত্রকানার ৭ মাইল দক্ষিণে পূর্ব্ব কোণে মদনপুর গ্রামে শাহ সুলতান সাহেবের মজার আছে, তাঁহার ঈছাল ছাওয়াব করিলে, মলতব পূর্ণ ও পীড়া আরোগ্য হয়। ইনি সৈয়দ শাহ দোরাখ ছাহেবের মুরিদ, তথায় তাঁহার ও অন্যান্য সর্ব্ব-সমেত ৪০ জন পীরের মজার আছে। ইনি মদনপুরের মদনকোচ, জঙ্গলবাড়ীর ভবানন্দ ও গড়জারি পার দলিপ সামন্তকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্যধিকার করেন।

তাঁহার দরগা জরিপ করা কালে আমিনের নাসিকা দিয়া রক্তপাত হইতে থাকে, শিকল অকর্ষণকারী মরিয়া যায়, কানুন গো পলইয়া যায়। একজন ইংরাজ জরিপ করিতে গেলে, শিকল ছিঁড়িয়া যায়। তাঁহার মজারের নিকট অদ্যবধি কেহ জরিপ করিতে পারে নাই। ঐ গ্রামের কন্যা অন্য গ্রামে বিবাহ দিলে, স্বামী স্ত্রীর একজন মারা গিয়া থাকে।

(৭) ময়মনসিংহ হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে মাইজ বাড়ী গ্রামে জাহাঁবখশ ফকিরের মাজার আছে, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদী পার

হইতে ইচ্ছা করিলে, দুষ্ট লোকে তাঁহাকে খুব গভীর স্থান দিয়া পথ দেখাইয়া বলে যে, এই পথ দিয়া গেলে, কাপড় বাঁচিবে, তিনি উহা পার হইয়া যান, তাঁহার কাপড় ভেজে নাই। পরে সেই দুষ্ট লোকেরা তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহে। দুইটী লোকের মধ্যে একটী মোকদ্দমা হয়, একজন আর একজনের ধান্যের চারা জোর করিয়া লইয়া নিজের ক্ষেতে রোপন করে, ফরিয়াদি আসামীর নামে মোকদ্দমা রুজু করে। ফরিয়াদি "দুধের-সর" নামক ধান্য লাগাইয়াছিল, আসামী হাকিমের নিকট শামরণ ধান বলিয়া প্রকাশ করে। হাকিম কোন ধান্য তাহা পরীক্ষা করার জন্য মামলা মুলতবি রাখেন। আসামী শাহ সাহেবের নিকট সত্য কথা বলিয়া খাঁটি তওবা করে, তিনি দোয়া করেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা শামরণ ধানের চারা বলিয়া প্রমাণিত হয়, ইহাতে সে খালাস পায়।

(৮) ময়মনসিংহ হইতে ২ মাইল পশ্চিমে জেলখানার পশ্চিম পার্শ্বে জামে মসজেদের দক্ষিণ কোণে মাওলানা আব্বাছ আলি সাহেবের মাজার আছে, ইনি মাওলানা আশরাফ আলি সাহেবের মুরিদ। ইনি বড় কামেল ও উক্ত জেলার হাদী ছিলেন।

(৯) কিশোরগঞ্জের ২০ মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মির্জ্জাপুর গ্রামে জনাব মাওলানা হাশেম সাহেবের মাজার আছে, ইনি মাওলানা থানবীর মুরিদ ছিলেন, একজন হিন্দু পেট বেদনায় অস্থির হইয়া বহু চিকিৎসার পরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দোওয়া চাহে, তিনি তাহাকে মুসলমান হইতে বলেন, সে মুসলমান হইলে, তাহাকে গাছের একটা পাতা খাইতে বলা হয়, ইহাতে সে আরোগ্য লাভ করে।

(১০) ময়মনসিংহ হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে ঠিকনা গ্রামে শাহ আশেকুল্লাহ ছাহেবের মাজার আছে, ইনি প্রায় ৪০ বৎসর এন্তেকাল করিয়াছেন, তিনি বড় বোজর্গ ছিলেন।

(১১) ময়মনসিংহের মশাখালি ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে কান্দিপাড়া গ্রামে শাহ আহছানুল্লাহ সাহেবের মাজার আছে, তাঁহার হোজরা শরিফে কেহ নিদ্রিত থাকিতে পারে না।

(১২) শেরপুর টাউনের শাহ জালাল নামক একজন অলির গোর আছে।

(১৩) টাঙ্গাইলের ১২ মাইল পূর্ব্ব উত্তর দিকে ভণ্ডেশ্বর গ্রামে শাহ্ একিন সাহেবের মাজার আছে। টাঙ্গাইলের কাগমারি গ্রামে শাহ্ জামান সাহেবের মাজার আছে, তিনি কাশমিরি সাহেবের ভাগিনেয় ছিলেন।

(১৪) টাঙ্গাইলের দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কাগমারি গ্রামে শাহ জামাল ছাহেবের মাজার আছে।

(১৫) নেত্রেকোনার সাড়ে এগার মাইল দক্ষিণে বাশহাটী গ্রামে শাহ জামাল উদ্দিন সাহেবের মাজার আছে, ইনি বাঘের উপর আরোহণ করতঃ শাহ সুলতান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

(১৬) টাঙ্গাইলের ৯ মাইল দক্ষিণে ইছলামপুরে পীর সৈয়দ এছমাইল ছাহেবের মাজার আছে।

(১৭) গৌরিপুরের নিকট কেল্লা বোকাইনগরে নিজাম আওলিয়া ছাহেবের মাজার আছে।

দিনাজপুর

(১) ধামুইর হাটের নিকট বাদাল গ্রামে আশেক পীর সাহেবের মাজার আছে।

(২) ঠাকুরগাঁহ মহকুমার ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে জিনপুর গ্রামে একজন পীরের মজার আছে।

(৩) দিনাজপুরের চকবাজিতপুরে মৌলবি মোহাম্মদ তাফাজ্জোল হোসেন ছিদ্দিকী সাহেবের মজার আছে, ইনি জৌনপুরী মাওলানা কারামত আলি সাহেবের খলিফা ছিলেন।

(৪) বালুর ঘাট হইতে ২০ মাইল পশ্চিম উত্তর কোণে ধল দীঘিয়ত মোল্লা আতা সাহেবের মাজার আছে, প্রায় ২ হাজার বিঘা জলকর উত্তর দক্ষিণ লম্বা একটি পুষ্করিণী তাঁহার কারামতে পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা হইয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে। সমস্ত পুষ্করিণী তাঁহার নামে পীর পাল রহিয়াছে।

(৫) দিনাজপুরের ৬ মাইল উত্তরে খালখুলি গ্রামে গাজি ছাহেবের মাজার আছে।

(৬) দিনাজপুর টাউনের গোরা সৈয়দ সাহেবের মাজার আছে।

(৭) বালুর ঘাট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে মাহিগঞ্জ গ্রামে একজন বোজর্গের মাজার আছে। তাঁহার নামে অনেক লাখোরাজ জাএদাদ আছে। তথায় একটি পুরাতন পাথরের মছজেদের ধ্বংসাবিশেষ আছে। এই মছজেদের শিলা লিপিতে বুঝা যায় যে, উহা প্রায় ৫/৬ শত বৎসর হইয়াছে।

(৮) নীতপুরে পাঁচ পীরের মাজার আছে।

(৯) নীতপুরের ২ মাইল উত্তরে বিষ্ণুপুর গ্রামে পীর মালেক জাহান ছাহেবের ও বিবি শুয়া ছাহেবের মজার আছে।

(১০) নীতপুরের আধ মাইল দক্ষিণে শিতোলী গ্রামে হজরত বালা শহীদ সাহেবের মাজার আছে।

(১১) নীতপুরের ২ মাইল দক্ষিণে গাইনর গ্রামে হজরত

পাগল দিয়ওয়ান সাহেবের মাজার আছে।

(১২) শীবার ২ মাইল পশ্চিমে ঘাটনগরে গোরা শহীদ ছাহেবের মাজার আছে।

(১৩) বালুর ঘাট হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে কাঁটা-বাড়ী বন্দরে পীর ছদরদ্দিন সাহেবের মাজার আছে।

(১৪) উহার নিকট কাঞ্চনে পীর জহিরদ্দিন আহম্মদ সাহেবের মাজার আছে। এই দুই বোজর্গ ছা'দবোনের হইতে আসিয়াছিলেন।

(১৫) শীবার ২ মাইল পশ্চিমে ঘাটনগরে হজরত গোরা শহিদ সাহেবের মাজার আছে।

(১৬) তিলনার দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে চান্দইল গ্রামে ঠশা মিএাজির মাজার আছে।

(১৭) চাংকুড়ির ১ মাইল পশ্চিমে হরিপুর গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে, কেহ তাঁহার নাম মাহিসেন্তোষি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১৮) শীবার ২ মাইল দক্ষিণে বোরাম সিরাজপুরে একজন পীরের মাজার আছে।

(১৯) শীবার ২ মাইল পূর্ব্বদিকে খড়িবাড়ী গ্রামে নেংড়া শহীদ সাহেবের মাজার আছে।

(২০) দেবকোটের আশে পাশে সুলতান শাহ, শাহ-বোখারি ও পীর বাহাউদ্দিনের মাজার আছে।

(২১) দেবকোট দুর্গের এক মাইল দুরবর্ত্তী দহল দীঘির তীরে মাওলানা আফতাবদ্দিন কোতব নামক একজন দরবেশের মাজার আছে। সেকেন্দর শাহ, এই মাজারের একটী গুম্বজ নির্ম্মাণ সমাপ্ত করেন।

(২২) পীরগঞ্জ ষ্টেশনের ৫ মাইল পশ্চিমে গোগোর গ্রামে

বনপীর সাহেবের মাজার আছে।

(২৩) উক্ত ষ্টেশনের ৫ মাইল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পোকেম্বা গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে।

(২৪) উক্ত ষ্টেশনের ১২ মাইল পশ্চিম উত্তর নেক মর্দ্দন গ্রামে পীর নেক মরদ ছাহেবের মাজার আছে।

(২৫) পীরগঞ্জের ২ মাইল উত্তরে ভেনা তৈল গ্রামে দরবর গাজীর পোক্তা মাজার আছে, ইনি সম্রাট শাহ জাহান বাদশার সময় ইছলাম প্রচারের জন্য এদেশে আগমণ করিয়াছিলেন, ইনি কারামত বিশিষ্ট পীর।

(২৬) পরাগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে পীর শেখ সেরাজ উদ্দিন আওলিয়ার মাজার আছে, ইনি শাহ জাহান বাদশার সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। কিছু লাখেরাজ জমিও তাহার সেবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

(২৭) গোদাগাড়ীর ২ ক্রোশ দক্ষিণে একজন পীরের মাজার আছে।

(২৮) কালিয়াগঞ্জ ষ্টেশনের ৮ মাইল উত্তরে তাজবাজ গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে।

(২৯) রায়গঞ্জ ষ্টেশনের ৩ মাইল উত্তরে ফুল-বাড়ী গ্রামে মখদুম শাহ সাহেবের মাজার আছে।

(৩০) পীরগঞ্জ ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম গাটিয়া গ্রামে পীর শহজোঁ সাহেবের মাজার আছে।

(৩১) রায়গঞ্জ ষ্টেশনের ৬ ক্রোশ উত্তরে কালিয়া দীঘি গ্রামে হোসেন মুরিয়া বাগ্দাদী ছাহেবের মাজার আছে, ইনি উক্ত স্থানে আগমন করিয়া বালিয়া রাজার নিকট সামান্য স্থান চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে সামান্য স্থান দেন, ইনি বৃক্ষতলে গরুর চামড়া

বিছাইয়া দিলেন, চামড়াখানা কাঁচা গোস্ত সহ লম্বা হইতে হইতে রাজবাড়ী বেষ্টন করিয়া ফেলিল, রাজা " রাম রাম " করিতে করিতে স্ত্রী ও কন্যাসহ দীঘিতে ডুবিয়া মরিলেন। গৌড়ের হোসেন শাহ ইহা শ্রবণে উক্ত রাজার এক লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিলেন। সম্রাট শাহ জাহান উক্ত দান মঞ্জুর করিয়াছিলেন, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট উক্ত দান সাব্যস্ত রাখিয়া ছিলেন। ইনি পানির উপর জায়নামাজ বিছাইয়া নামাজ পড়িতেন। তথায় পোক্তা মসজেদ, মাজার ও বালিয়া দীঘি নামক ১৩/১৪ বিঘা আয়তনের একটি দীঘি আছে। শাহ জাহান বাদশাহ তাঁহাকে ৪৫ বিঘা লাখেরাজ দিয়াছিলেন।

(৩২) তথায় পীর এমাম আলি শাহ, পীর আলি শাহ রওশন আলি শাহ, জামায়াত আলি শাহ, ও ফারাজ আলি শাহ ও পাহাড় আলি শাহ সাহেবগণের মাজার আছে।

(৩৩) বাম্পণবাড়ী ষ্টেশনের ৬ ক্রোশ উত্তরে মোহশো কমলা বাড়ীতে ৫/৬ জন অলির মাজার আছে। ১০ বিঘা লাখোরাজ জমি তাঁহাদের মাজারের সেবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

(৩৪) রুহিয়ার ১মাইল পূর্ব্ব উত্তর কোণে রাধানগর গ্রামে শেখ ছদ্দু সাহেবের মাজার আছে, শাহ জাহান বাদশাহ উহার সেবার জন্য ৪৫ বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন।

রংপুর

(১) মাহিগঞ্জে হজরত শাহ জালাল বোখারি ছাহেবের মাজার আছে। ইনি তথাকার মুনশী আফানুল্লাহ কবিরাজ ছাহেবকে স্বপ্ন যোগে বলেন, তুমি আমার মাজারের হেফাজত করিবা। আমি

তোমাকে কয়েকটা পরীক্ষিত ঔষধ শিক্ষা দিতেছি, তুমি ইহা প্রস্তুত করিয়া পীড়িতদিগকে ব্যবহার করিতে দিবে, তোমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইবে। তিনি তাহাই করিয়া ধান্যাঢ্য হইয়া গিয়াছিলেন।

(২) ভূতছাড়া ষ্টেশনের ২ মাইল দূরে বড় দরগা নামক স্থানে শাহ এছমাইল গাজি ছাহেবের মাজার আছে। ইনি শ্রীহট্টের শাহ জালাল এয়মনি ছাহেবের সহচর ছিলেন।

(৩) রংপুর টাউন হইতে ৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বেতগাড়ী গ্রামে পীর কছিমদ্দিন শাহ ছাহেবের মাজার আছে। ইনি হজরত ছুফি ফতেহ্ আলি ছাহেবের খলিফা ছিলেন।

(৪) ভূতছাড়ার নিকটে কুটীর পাড়া গ্রামে ছাত্তার খাঁ ছাহেবের মাজার আছে, মানাশ নদী কবরের দুই পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কিন্তু খোদার মজ্জিতে পীর ছাহেবের কবর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(৫) রংপুর ষ্টেশন হইতে ৬/৭ ক্রোশ উত্তরে রাজবল্লভ গ্রামে মুনশী জিনাতুল্লাহ ছাহেবের মাজার আছে, ইনি বোজর্গ ছিলেন।

(৬) ভূতছাড়া ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল উত্তরে ধুমের পাড় গ্রামে মুঃ কায়েমুল্লাহ ছাহেবের মাজার আছে, ইনিও বোজর্গ ছিলেন।

(৭) রংপুরের সদরে মুনশী পাড়ায় হজরত মাওলানা শাহ কারামত আলি ছাহেবের মাজার আছে। ইনি হিন্দুস্থানের জৌনপুরী নিবাসী ছিলেন। ইনি হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ছাহেবের খলিফা ছিলেন। ইনি কত দিবস হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি (কোঃ)র খেদমতে ছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, তিনি ৬ মাস তাঁহার খেদমতে ছিলেন, কেহ বলেন, তিনি মাত্র ১৬/১৭ দিবস তাঁহার খেদমতে ছিলেন। যাহা হউক, হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে অল্প দিবস থাকিলেও বহু বৎসরের আত্মিক ফয়েজ লাভ হইত, ইহা বহু লোকের বর্ণনা। কলিকাতার মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেব যিনি ফুরফুরার

হজরত পীর ছাহেবের হাদিছ তফছিরের ওস্তাদ ছিলেন — তিনি মাত্র ৭ মাস হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে ছিলেন, ইহা আমার ওস্তাদের রেওয়াএত। চট্টগ্রামের ছুফি নুর মোহাম্মদ সাহেব প্রথমে ঢাকার ছুফি রওশন আলি ছাহেবের নিকট শিক্ষা করিয়া কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকার কামেল খলিফা হইয়াছিলেন, হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদ (কোঃ) কলিকাতায় আগমন করিলে, হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে তিনবার স্বপ্নযোগে আদেশ করেন, হে নুর মোহম্মদ, আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ কলিকাতায় আসিতেছেন, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। তখন হইতে তিনি হজরত সৈয়দ সাহেবের খেদমত শরিফে তাঁহার জেহাদ করা কাল পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তিনি কত কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, ইহা আমাদের জানা নাই।

নওয়াখালীর ছা'দুল্লাপুরের মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের খেদমতে ২৫ বৎসর ছিলেন, ইহা স্বয়ং মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায় কারামতের ২য় খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব যখন পাঞ্জাবের রনজিৎ সিংহের সহিত জেহাদ করিতে যান, তখন মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব ছুফি নুর মোহাম্মদ ছাহেব ও হাফেজ মাওলানা জামালদ্দিন ছাহেব তাঁহার সহচর রূপে গমন করিয়া ছিলেন, কিন্তু হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব নিজের দেনাদার থাকার অজুহাতে জেহাদে যোগদান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি সেই সময় হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবকে বলেন, হুজুর, আমার তরিকত শিক্ষা করিতে যাহা বাকি থাকিল, ইহার সংশোধন কিরূপে করিব? তদুত্তরে মোজাদ্দেদ ছাহেব বলেন, তুমি ছেরাতোল মোস্তাকিম কেতাব দেখিয়া আমল করিবা। ইহা শ্রবণে তিনি বলেন, আমি 'ছেরাতোল-মোস্তাকিম' কেতাব কাহার নিকট বুঝিয়া

লইব। হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সুদারামের মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব তোমাকে উহার প্রতি অক্ষর বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহার নিকট তুমি উহা বুঝিয়া লইবা এবং তরিকরে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবা।

মোজাদ্দেদ ছাহেব জেহাদ অন্তে পাহাড়ে গায়ের হইয়া থাকিলেন, আর ইহার তিন মাস পরে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব নওয়াখালিতে ফিরিয়া আসিয়া একাধারে শরিয়ত ও তরিকত শিক্ষা দিয়া নওয়াখালী কেন, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি দেশ হেদাএত করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব নিজ পীরের আদেশ পালনার্থে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কুমিল্লায় শোজা বাদশার মছজেদে ছেরাতোল-মোস্তাকিম কেতাব পড়িয়া বুঝিয়া লইলেন। মাওলানা ছুফি একরামোল হক মোর্শেদা বাদী ছাহেব বলেন, জৌনপুরী হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের নিকট আবশ্যক মত শরিয়ত ও তরিকত উভয় এলম শিক্ষা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। জৌনপুরী হজরত যে নফ্ছ মরা পীর ছিলেন, তাঁহার এই কার্য্যে তাহাই প্রমাণিত হয়।

জৌনপুরী হজরত জখিরায়-কারামতের ২য় খণ্ডের (৫৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, " মোরশেদ-বরহক ছেরাতোল-মোস্তাকিমের উপর আমল করিতে মৌখিক আমাকে তাকিদ করিয়াছিলেন এবং আমার খেলাফত নামায় স্পষ্টভাবে উহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। মাওলানা এমামদ্দিন সুদারামি মরহুম ২৫ বৎসর মোর্শেদ-বহরক ছাহেবের খেদমতে ছিলেন, তিনি ছেরাতোল-মোস্তাকিম কেতাব রচিত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি মোর্শেদ-বরহককে এই পাক কেতাব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুনাইয়াছিলেন এবং আমিও কুমিল্লাতে শোজা বাদশার মছজেদে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের নিকট ছেরাতোল-মোস্তাকিম কেতাবের সমস্ত অংশ শুনাইয়া

ছিলাম ”।

উভয় পীর ভাইর মধ্যে প্রবল ভালবাসা ছিল, জৌনপুরী হজরত অনেক সময় মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের ছা'দুল্লাহপুর বাটীতে অবস্থান করিতেন, পক্ষান্তরে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব দেশের লোকদিগের নিকট নিজের পীর ভাই জৌনপুরী হজরতের পরিচয় করাইয়া দিতে ও তাহার সম্মান খাতির করার অছিএত করিতে চেষ্টা করিতেন।

যখন হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব হজ্জে রওয়ানা হইলেন, তখন যদিও অনেক উপযুক্ত খালফা স্থির করিয়াছিলেন, তথাচ পীর ভাই জৌনপুরী হজরতের হেদাএতের আকুল আকাঙ্খা দেখিয়া ও খোদা কর্ত্তৃক ঈশারা পাইয়া শেষ অছিএত করিয়া গেলেন, হে পীর ভাই, আপনি আমার মুরিদ, ভক্ত ও দেশবাসিদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন, তরিকত ও মা'রেফাত যতদুর লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারুন, আর নাই পারুন, কেতাব পত্র রচনা করিয়া অহাবি, শিয়া, বে-জুমা, বেদয়াতিদিগের খণ্ডন করিতে থাকিবেন। যে সময় ছুফি হজরত নুর মোহাম্মদ ছাহেব চট্টগ্রামকে তরিকতের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতেছিলেন, কলিকাতার হাফেজ মাওলানা জামালদ্দিন ছাহেব ও ফুরফুরার খান্দানের পীরগণ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ হেদাএত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় জৌনপুরী হজরত পূর্ব্ববঙ্গে ইসলামের জ্যোতিঃধারা বিকিরণ করিতে লাগিলেন। যদিও মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের কামেল ও খলিফাগণ তরিকত প্রচারে রত ছিলেন, কিন্তু জৌনপুরী হজরত ছাহেব জাহেরী শরিয়ত দৃঢ় করিতে সংলিপ্ত হইলেন। তিনি বোটযোগে কোন গ্রামে গিয়া নিকটস্থ মছজেদে জামায়াত সহ নামাজ পড়িতেন। নিকটে মছজেদ না থাকিলে, নদীর তীরে উঠিয়া জামায়াত করিয়া নামাজ পড়িতেন। তিনি হাজিগঞ্জের মছজেদে নিজে আজান দিয়াছিলেন।

চরমাদারির মুনশী আবদুল ছামাদ ও রায়পুরার আশরাফদ্দিন

পণ্ডিত সাহেবদ্বয় বলিয়াছেন, এক সময় জৌনপুরী হজরত রায়পুরার বড় মছজেদে এমামত করিতেছিলেন, একজন হিন্দুস্তানী হাফেজ মোক্তাদী এক্তেদা ছাড়িয়া দিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, মাওলানা কোরআন ভুল পড়েন, মাওলানার নামাজ হয় নাই। ছালাম ফিরাইয়া জৌনপুরী হজরত বলিলেন, কোন ব্যক্তি নামাজে লোকমা দিয়াছেন? হাফেজ সাহেব বলিলেন, আপনি কোরান ভুল পড়েন, এই হেতু আমি নামাজে লোকমা দিয়াছি। জৌনপুরী হজরত সেই হাফেজ ছাহেবকে বোটে রাখিয়া কেরামতের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

জৌনপুরী হজরত শরহে জইরির ভূমিকায় ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আমার ধারনা ছিল যে, আমি কোরআন শুদ্ধ পড়িয়া থাকি, পরে মক্কা শরিফে যাইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমার কোরআন পড়ায় ভুল হইয়া থাকে, তৎপরে আমি আড়াই বৎসর মক্কা শরিফে থাকিয়া কেরাতের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছি। যাহারা খাঁটি আলেম, খোদা পরস্ত হাদী, তাঁহারা লোক-লজ্জা ত্যাগ করতঃ নিজেদের ক্রটী সংশোধন করিয়া লইয়া থাকেন, ইহা দোষের কথা নহে বরং প্রশংসা বই আর কিছুই নহে। হজরত জৌনপরী মাওলানা এক গ্রামের মছজেদে ১০/১৫ দিবস থাকিয়া ফজরের নামাজ অন্তে ২/৫ গ্রামের খতিব, আখুঞ্জি ও মুনশীদিগকে লইয়া কেরাত শিক্ষা দিতেন, কখনও ওয়াজ নছিহত করিতেন। পরে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া অন্য গ্রামে গিয়া এইরূপ করিতেন, তিনি রায়পুরা গ্রামে প্রায় এক মাস কয়েক জন লোককে জেকর মোরাকাবা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কোন ফলোদয় হয় নাই। ইহাতে হজরত মাওলানা বলিয়াছিলেন, তোমাদের স্ত্রীদিগের পর্দ্দা নাই, এই হেতু আমার তাওয়াজ্জোহ প্রদানে তোমাদের ফলোদয় হইল না। হজরত মাওলানার এই কথা একেবারে সত্য, যাহারা সুদখোরের দাওত খায় কিম্বা গোনাহ কবিরা করে, তাহাদের

লতিফাসমূহ জারি হইতে পারে না। সেই হইতে তিনি জাহিরি-শরিয়ত দৃঢ় করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

যদিও তাঁহার সময়ে বহু পীর, আলেম ও কামেল বঙ্গদেশ হেদাএত করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের রচিত কেতাব বড় বেশী নাই বলিয়া তাঁহাদের নাম নিশান ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। চারি শত হিজরী হইতে আরম্ভ করিয়া বগুড়ার মহাস্তানের শাহ ছুলতান মির ছৈয়দ মহমুদ মাহি ছওয়ার, শ্রীহট্টের শাহ জালাল এয়নি, মালদহের পাণ্ডুয়ার শাহ জালাল তবরেজি, নোয়াখালী কাঞ্চনপুরের সৈয়দ আহমদ তন্নুরি ওরফে মিরান শাহ, হরিহরপুরের শাহ হাছান, ত্রিপুরার শ্রীপুর গ্রামের হজরত রাস্তি শাহ, ভারেল্লার শাহ এছরাইল, চট্টগ্রামের শাহ বদর, খুলনা বাগের হাটের খান জাহান আলি পীর, ২৪ পরগণা ছৈয়দ আব্বাছ ওরফে গোরাচাঁদ পীর ও বারাশতের একদল পীর, ঢাকায় শাহ আলি, উঃ ২৪ পরগণা বশিরহাটের শাহ আলি, বগুড়ার আদম দিঘীর বাবা আদম, মোর্চ্চা শেরপুরের শাহ তোর্কমান প্রভৃতি শত শত অলিউল্লাহ বঙ্গদেশে হেদাএত করিয়া গিয়াছেন, এমন কি পূর্ব্ব-বঙ্গের বড়হাদী মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব কল্পনাতীত ইছলামি খেদমত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী দুনইয়াতে নাই বলিয়া বঙ্গের নর-নারী তাঁহাদের খোজ খবর রাখেন না। দুনইয়াতে চির-জীবি হইতে গেলে, ইছলামি কেতাব রচনা করিয়া যাওয়া দরকার।

আমাদের ভক্তি ভাজন মাওলানা কারামত আলি মরহুম মগফুর ছাহেব সময়োপযোগী বহু কেতাব রচনা করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

যে সময় অহাবি সম্প্রদায় লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া হানাফীদিগকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় কলিকাতার হেড মোদার্রেছ মাওলানা আজিজুল্লাহ ছাহেব কয়েক খানা কেতাব লিখিয়া ও জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব নছিমোল-

হারামএন, কুওয়াতোল-ঈমান, এস্তেকামত, কওলোছ ছাবেত প্রভৃতি কয়েক খানা কেতাব লিখিয়া তাহাদের মতবাদের খণ্ডন করেন।

যে সময় শিয়া ফেরকা, হানাফীদিগকে প্ররোচিত করিয়া নিজের দলের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন, সেই সময় জৌনপুরী হজরত কুওয়াতোল-ঈমান লিখিয়া তাহাদের মতের প্রতিবাদ করেন।

যে সময় বে জুমাদলের নেতা ফরিদপুরের হাজি শরিয়তুল্লাহ ছাহেব ও মৌলবী আবদুল জাবব্বার ছাহেব লোকদিগের জুমার নামাজ ছাড়াইতে ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহাদের সহিত মৌখিক ও লিখিত তর্ক বাহাছ করিয়া ও তাজকিয়াতোল-আকায়েদ ও হোজ্জাতে-কাতেয়া লিখিয়া তাহাদের পূর্ণ খণ্ডন করিতেছিলেন। যে সময় শরিয়ত বিদ্রোহী ফকির দল হানাফী দিগকে শরিয়ত বিদ্রোহী ন্যাড়ার দলে পরিণত করিতে চেষ্টাবান হইতেছিল, জৌনপুরী হজরত তাহাদের খণ্ডনের জন্য নুরোল-হোদা, রফিকোছ-ছালেকিন, জাদোত্ত কওয়া, নুরোল আলানুর ও রেছালায় ফয়েজেআ'ম কেতাবে লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

যে সময় চট্টগ্রামের মৌলবি মোখলেছার রহমান প্রভৃতি বেদায়াতি দল হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব ও মাওলানা কারামত আলি ছাহেবকে অহাবি বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া প্রচার করিতে ছিলেন, সেই সময় তিনি মোকাশাফাতে-রহমত, মাকামেওল-মোবতাদেইন ও নুরল-আলা-নুর রচনা করিয়া তাহাদের মতের অসারতা প্রকাশ করেন। যে সময় গোলাবি অহাবিরা মিলাদ কেয়াম বেদয়াত বলিয়া প্রচার করিতে ছিলেন, সেই সময় তিনি মোলাখ্যাছ ও কওলোছ ছাবেত প্রভৃতি রচনা করেন।

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা একদল লোক সত্যের উপর প্রবল থাকিয়া বিরুদ্ধবাদিদিগের প্রতিবাদ করিতে

থাকিবেন।

ভক্তিভাজন জৌনপূরী হজরত সেই সময়ে বঙ্গদেশে হজরতের উল্লিখিত হাদিছ অনুসারে বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতিবাদ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। খোদাতায়ালা উক্ত হজরতকে এই বিরাট খেদমতের জন্য আ'লা ইল্লিনে স্থান দিন।

যদিও জৌনপুরী হজরত কামেল পীর ছিলেন, কিন্তু তিনি জাহেরী শরিয়তের জরুরী খেদমত করিতে গিয়া তরিকতের এলম প্রচার করিতে সুযোগ পান নাই। একটা মানুষের দ্বারা সমস্ত খেদমত প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণে তিনি বেশী সংখ্যক তরিকতের কামেল খলিফা ত্যাগ করিয়া যান নাই। প্রাচীন বৃদ্ধেরা একবাক্যে বলিয়াছেন, হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের তিনজন খলিফা দ্বারা তিন কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। ছুফি নুর মোহম্মদ ছাহেব অধিক পরিমাণ তরিকত শিক্ষা দিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জৌনপুরী হজরত অধিক সময় জাহিরী শরিয়ত দৃঢ় করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব একধারে উভয় বিষয় শিক্ষা দিতে প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

হজরত মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের অনেক কারামতের কথা শুনা যায়। যদিও প্রত্যেকটী ছহিহ প্রমাণে প্রমাণিত না হয়, তথাপি উহার কতকগুলি যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) আমি আমার বাল্য-শিক্ষক ছুফি আবদুস শাফি ছাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এক সময় চিলে তাঁহার বোট হইতে একটী মুরগীর বাচ্চা উড়াইয়া লইয়া যায়। মাওলানা ইহা শ্রবণ করিয়া বলেন, আচ্ছা, চিলে উহা ফেরত দিয়া যাইবে, একটু পরে চিলে জীবন্ত অবস্থায় বাচ্চাটি ফেরত দিয়া যায়।

(২) আরও তিনি বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোকের উপর

একটা জ্বেনের আছর ছিল, অনেক আলেম তাহাকে তাড়াইতে গিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল, ঐ স্ত্রীলোকটার কর্তৃপক্ষ জৌনপুরী হজরতকে লইতে আসিয়াছিল। তাঁহার নওয়াখালীর বিবি উক্ত দুষ্ট জ্বেনের ব্যাপার শুনিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি হজরত মাওলানা ছাহেবকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। মাওলানা ছাহেব তথায় না গিয়া একখানা কাগজে ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন, "হে জ্বেন, যদি তুমি হজরত ছৈয়দ আহমদ ছাহেবকে জামানার মোজাদ্দে বলিয়া স্বীকার কর, তবে পত্র পাওয়া মাত্র চলিয়া যাও।"

জ্বেনটী এই পত্র পাওয়া মাত্র বলিল, তোমরা জৌনপুরী হজরতকে আমার ছালাম জানাইয়া বলিয়া দিও, আমি আর এই স্ত্রীলোকের নিকট আসিব না।

(৩) জলপাইগুড়ির এক পণ্ডিত ছাহেবের বর্ণনা,—জৌনপুরী হজরত এক গ্রামে কোন লোকের বাটীতে মিলাদ পড়িতেছিলেন, কেহ গোলাপ ছিটাইতেছিল, ইহাতে উক্ত হজরত বলিলেন, গোলাপ ছিটাইতে হইবে না। একটু পরে উক্ত মজলিশটা সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হজরত মাওলানা ছাহেব বলিলেন, ইহা খোদার রহমত।

(৪) আরও তিনি বলিয়াছেন, এক সময় রাখালেরা খেলা করিতেছিল, এমতাবস্থায় একটা ঘুর্নি বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। জৌনপুরী হজরত কোন রাখালের হস্তে একখানা লিখিত পত্র দিয়া বলিলেন, ইহা ঘুর্নিবায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ কর। সে তাহা করিলে, অনেক মিষ্টান্ন শূন্য মার্গ হইতে জমিতে পতিত হইল। অন্য এক সময় রাখালেরা ঘুর্নিবায়ু প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া উহার মধ্যে সেই পত্রখানা নিক্ষেপ করিল, ইহাতে সেই রাখাল মারা গেল। হজরত মাওলানা ইহা শুনিয়া বলিলেন, প্রথম দিবস জ্বেন বাদশার পুত্রের বিবাহ ছিল, এই হেতু তাহারা আনন্দের দিবস বলিয়া মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করিয়াছিল, আর দ্বিতীয় দিবস তাহার এক পুত্র এন্তেকাল হইয়াছিল, তাহার জানাজার জন্য ইহারা যাইতেছিলেন, এমতাবস্থায়

সেই পত্র পাইয়া তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া রাখালকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

(৫) আক্কেলপুরের হাজি ফরিজুল্লাহ ছাহেবের বর্ণনা ঃ— হজরত মাওলানা ছাহেব আক্কেলপুরের ওয়াজের দাওতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অনেক লোক তৈল পানিতে ফুক দেওয়াইয়া লইতেছিলেন, একটা হিন্দু বলিল, হুজুর আমার পাত্রের পানিতে ফুক লাগে নাই। ইহাতে জৌনপুরী হজরত দ্বিতীয়বার তাহার পানি পাত্রে ফুক দিলেন, অমনি তাহার পাত্রটী ফাটিয়া যায়। তৎপরে তিনি আক্কেলপুর হইতে রংপুর মুনশী পাড়ায় উপস্থিত হইয়া এন্তেকাল করেন। তাহার মাজার শরিফের পশ্চিম পার্শ্বে বিরাট আকারের একটী পোক্তা মছজেদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাঁহার মাজার শরিফ মছজেদের পার্শ্বস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে। তাঁহার সাহেবজাদা হজরত মাওলানা আবদুল আউওল ছাহেব বৎসর বৎসর ফাতেহাদোয়াজদহমের সময় তথায় ঈছালে-ছওয়াবের মজলিশ করিতেন। তাঁহার এন্তেকালের পরে কয়েক বৎসর তাঁহার পুত্র মাওলানা হাম্মাদ ছাহেব তথায় ঈছালে ছাওয়াবের মজলিশে শরিক হইতেন। মুনশী পাড়ার স্বনাম ধন্য জমিদার সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ ছাহেব এই ঈছালে ছওয়াবের কার্য্য সুচারু রূপে পরিচালনা করিতেন। এখন তিনি আর ইহ-জগতে নাই, তাঁহার স্থলভিষিক্তগণ এই কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

হজরত মাওলানা ছাহেব কয়েকটী বিবাহ করেন, এক বিবির পক্ষ হইতে মাওলানা হাফেজ আহমদ ছাহেব ও মাওলানা মাহমুদ ছাহেব পয়দা হন। মাওলানা হাফেজ আহমদ ছহেব নিঃসন্তান অবস্থায় এন্তেকাল করেন। মাওলানা মাহমুদ ছাহেব হজরত মাওলানা হাফেজ আবদুর রব ছাহেব প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া এন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় বিবির পক্ষ হইতে হজরত মাওলানা হাফেজ আবদুল আউওয়াল ছাহেব ও পাগলা মিঞা পয়দা হন। মাওলানা আবদুল আউওয়াল ছাহেব মাওলানা হাম্মাদ, মাওলানা আবদুল বাতেন

প্রভৃতিকে রাখিয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। পাগলা মিঞার মাজার নওয়াখালীর মাওলানা হামেদ ছাহেবের বাটীতে আছে।

তৃতীয় নওয়াখালীর বিবির পক্ষ হইতে মাওলানা হামেদ ছাহেব পয়দা হন। ইনি মাওলানা ছালাহদ্দিন ও মাওলানা অলিউদ্দিন প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া এন্তেকাল করিয়াছেন।

একটি আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন

আমি বিগত ১৩৩৯ সনের ফাল্গুণ মাসে ত্রিপুরা ও নোওয়াখালীতে কয়েকটী সভা করিয়াছিলাম, আমি সেই সময় ছা'দুল্লাপুরের মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের জীবনী ভাল ভাল লোকদিগের সাক্ষ্য লইয়া লিখিতে ছিলাম। ভাবানীগঞ্জের মাওলানা আজিজর রহমান ছাহেব ৬ই ফাল্গুন দিবাগত রাত্রে আন্দাজ ১টার সময় নিম্নোক্ত স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন।

এক স্থানে আমি গোনাহ্‌গার খাকছার রুহুল আমিন যেন সহস্র লোকের মজলিশে ওয়াজ করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় কেরওয়ারচরের মাওলানা আবদুল মজিদ মরহুম ছাহেব সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনারা চুপ করুন, এখন আর ওয়াজ হইবে না। তৎশ্রবণে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, সভায় ওয়াজ কেন বন্ধ হইবে? ইহাতে তিনি বলিলেন, এরূপ তিনজন বোজর্গ এই সভায় আগমন করিতেছেন যে, সভার ওয়াজ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। তৎপরে তিনি মাওলানা আজিজর রহমান ছাহেবকে বলিলেন, ঐ দেখুন তাঁহারা আসিতেছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একখানা আট ঘোড়ার গাড়ীতে তিনজন বোজর্গ আসিতেছেন। ত্রিপুরায় কেরওয়ারচরের মাওলানা আবদুল মজিদ

মরহুম, নোয়াখালীর রায়পুরার মাওলানা গোলাম রহমান মরহুম, নোয়াখালীর অশ্বদিয়ার মাওলানা আবদুছ ছালাম ছাহেব ও বরিশালের মাওলানা নেছরদ্দিন ছাহেব রাস্তা ছাড় রাস্তা ছাড় বলিয়া লোকদিগকে ফাক্ করিতেছেন। গাড়িখানা ওয়াজের মজলিশে তক্তপোশের নিকট পৌঁছিয়া গেল। তথায় চারিখানা কুরছি ছিল, এক খানা কুরছিতে হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবি (রঃ), দ্বিতীয় কুরছিতে হজরত মাওলানা এমামদ্দিন ছা'দুল্লাপুরী (রঃ) ও তৃতীয় কুরছিতে হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী (রঃ) বসিলেন চতুর্থ কুরছিখানা খালি থাকিল। একটু পরে আর একখানা গাড়ীতে ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব তশরিফ আনিলেন, হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবি ছাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে চতুর্থ কুরছির উপর বসাইলেন। মাওলানা আজিজর রহমান ছাহেব বলেন, তাঁহারা চারি হজরত পরস্পরে অস্পষ্ট স্বরে কিছু আলোচনা করিতেছিলেন, আমি উহার কতকাংশ শুনিতে পাইতেছিলাম, কতকাংশ শুনিতে পাইতেছিলাম না। কতকাংশ বুঝিতে পারিতেছিলাম, আর কতকাংশ বুঝিতে পারিতেছিলাম না। পরে হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব বলিলেন, আপনারা এই ছেলেটির (রুহুল আমিনের) জন্য দোওয়া করুন। তিনি ইহা অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, এইহেতু কেহ হাত উঠাইতেছিলেন না। পরে তিনি মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবকে বলিলেন, বাবা, তুমি হাত উঠাও। ইহাতে তিনি বলিলেন, ফুরফুরার হজরত হাত উঠাইবেন। তখন ফুরফুরার হজরত হাত উঠাইয়া দুই হাত খুব ফাক্ ফাক্ করিয়া দোওয়া করিতে গিয়া এত রোদন ক্রন্দন করিলেন যে, তাঁহার চক্ষের পানিতে তাঁহার কাপড় ভিজিয়া যাইতেছিল। অবশিষ্ট তিন হজরত হাত উঠাইয়া আমিন আমিন বলিতেছিলেন। ফুরফুরার হজরতের রোদন করাতে তাঁহাদের শরীরে অজদ উপস্থিত হইল। সভার কয়েক সহস্র লোক তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে ফুরফুরার হজরত মোনাজাত শেষ করিলেন। তৎপরে হজরত

মোজাদ্দেদ ছাহেব এই গোনাহগার (রুহুল আমিন) কে বলিলেন, বাবা পিরহানটী খোল। আমি পিরহানের বোতামগুলি খুলিতেছিলাম। ফুরফুরার হজরত বলিলেন, পিরহানটী উচ্চ করিয়া উঠাও। আমি পিরহানটী বুকের অৰ্দ্ধেক পরিমাণ উঠাইলাম। হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব নিজের হাতে ধরিয়া পিরহানটী গলা পর্য্যন্ত উঠাইয়া গলা হইতে নাভি পর্য্যন্ত নিজের মোবারক হাত টানিয়া লইয়া ফুক্ দিলেন। তৎপরে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব আমার গলা হইতে নাভি পর্য্যন্ত মোবারক হাত ফিরাইয়া লইয়া এক ফুক্ দিলেন। তৎপরে মাওলানা কারামত আলি ছাহেব বলিলেন, বাবা তুমি বাঙ্গালার পীরগণের জীবনী লিখিতেছ, আমার জীবনী কি লিখিবা না ? আমি বলিলাম, হাঁ হুজুর, আমি লোকদিগের নিকট জানিয়া শুনিয়া আপনার জীবনী লিখিব। মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেব বলিলেন, বাবা, তুমি ভাই মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের জীবনী নিশ্চয় লিখিবা। তৎপরে মাওলানা আজিজর রহমান ছাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি চর পাড়ায় উপস্থি হইয়া আমার নিকট এই স্বপ্ন প্রকাশ করেন।
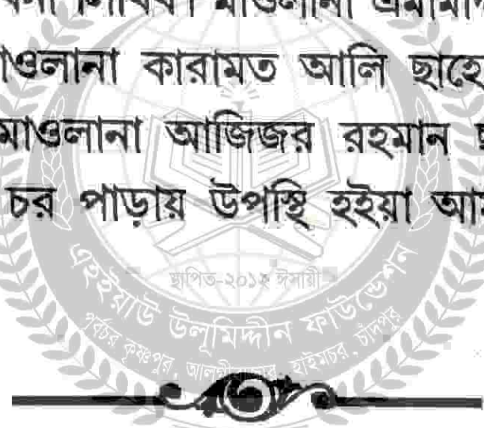
নোট

আমি ছুন্নত অল্-জামায়াতের আশ্বিন সংখ্যায় হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেবের জীবনী লিখিয়াছি, তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমার জানা ছিল না, একজন মেহেরবান আমকে জানাইয়াছেন যে, তিনি ১২১৫ হিঃ ১২০৫ বাংলা সনে জৌনপুরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৯০ হিজরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে বঙ্গ দেশের রংপুরে এন্তেকাল করেন। আমি লোকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছিলাম যে, তিনি হজরত ছৈয়দ ছাহেবের খেদমতে ৬ মাস

কিম্বা ১৬/১৭ দিবস ছিলেন, কিন্তু এখন জাদোত্তাক্ওয়া কেতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম, হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

حضرت مرشد برحق نے بریلی کی مسجد میں اٹھاوہ روز تک طریقت کے اسرار کو اس خاکسار کو سمجھایا *

" হজরত মোরশেদে-বরহক বেরেলীর মছজেদে এই খাকছারকে ১৮ দিবস পর্য্যন্ত তরিকতের গুপ্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি মোজাদ্দেদ ছাহেবের খেদমতে ১৮ দিবস তরিকত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

হজরত মাওলানা একদিনে দুই ঘন্টার মধ্যে নফি ও এছবাতের জেকর সমাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ১৮ দিবসে বহু উচ্চ দরজা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা কোন দোষের কথা নহে। হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) দেড় মাসে তরিকত শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীর খাজা বাকিবিল্লাহ (রঃ) দুই দিবসে তরিকত সমাপণ করিয়াছিলেন। পীর আবুবকর বেনে হাওয়ার এক রাত্রে এত বড় পীর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দোয়াতে মৃত জীবিত হইত।

কাজেই হজরত জৌনপুরী ছাহেব ১৮ দিবস তরিকত শিক্ষা করিয়া কামেল হওয়ার মহা যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা ইহাতে তাঁহার দোষ বুঝেন তাহারা ভুল বুঝিয়াছেন।

আমি লোকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছি যে, মাওলানা জৌনপুরী ছাহেব দেনাদার থাকার জন্য হজরত ছৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। ইহা অতি সত্য কথা। মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায়-কারামতের ২য় ভাগ ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

سواب اس خاکسار نے اس عزیمت کا ارادہ کیا ھے ھمارے سابق نے قرض کرنے پر بھائی لوگ ملامت نکریں اور پر بد مانی نکریں بلکہ ھمکو معذور جانیں اور ھمارے سابق کے قرض ادا ھونے کے واسطے اور حال میں عزیمت کا حال پیدا ھونے کے واسطے دعا کریں اور دل و جان سے کوشش کریں *

"এখন এই খাকছার আগামি দেনা না করার ইচ্ছা করিয়াছে, ভাইরা আমার পূর্ব্বে দেনার জন্য যেন আমাকে তিরস্কার না করেন এবং আমার উপর কুধারণা না করেন, বরং আমাকে মা'জুর জানেন এবং আমার পূর্ব্বের দেনা আদায় হওয়ার জন্য এবং বর্ত্তমানে নূতন দেনা না করার জন্য দোয়া করেন এবং দেলও জানে চেষ্টা করেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত মাওলানা ছাহেব দেনাদার ছিলেন। আরও উক্ত হজরত 'জাদোত্তাক্ওয়া'র ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اس خاکسار کو جہاد کے میدان میں انکی زیارت نصیب نھوئی مگر ان کا لکڑی چیرنا اپنی انکھ سے دیکھا *

"এই খাকছারের নছিবে উক্ত মোজাদ্দেদ ছাহেবকে জেহাদের ময়দানে দেখার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু নিজের চক্ষে তাঁহাকে কাষ্ঠ চিরিতে দেখিয়াছি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ছৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে জেহাদে

গমন করে নাই।

তিনি দেনার জন্য যে জেহাদে যোগদান করেন নাই, ইহা তাঁহার পরহেজগারির চিহ্ন, উহা প্রশংসা ব্যতীত দোষের কথা নহে। কেননা জেহাদ করা ফরজে কেফায়া, অন্যেরা আদায় করিলে সকলে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু দেনা পরিশোধ করা ফরজে আএন।

আমি উহাতে যে রায়পুরার আশরাফদ্দিন পণ্ডিত ছাহেব হইতে উল্লেখ করিয়াছি যে, একজন হাফেজ ছাহেব উক্ত মাওলানা ছাহেবের কেরাতের ভুল ধরিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি উক্ত হাফেজ ছাহেবকে বোটে লইয়া উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আমি একা শুনি নাই গাজিনগরের মুফ্‌তি মাওলানা আহমদুল্লাহ ছাহেব, শায়েস্তানগরের আইউব আলি পাটারি, তাঁহার বাটীর মৌলবি ছাহেব ও অন্যান্য কয়েক জন লোক ইহার সাক্ষী আছেন।

হাদিছের কানুন এই যে, যদি কেহ কথা বলিয়া অস্বীকার করেন, তবে শ্রোতাগণ বিশ্বাসী হইলে, উহা ছহিহ হাদিছ হইবে, বুঝিতে হইবে যে, প্রথম রাবি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। এমাম মোহাম্মদ আবুইউছোফের নিকট হইতে কতকগুলি মছলা রেওয়াএত করিয়াছিলেন, কিন্তু এমাম আবুইউছফ পরে উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাতে কি এমাম মোহম্মদের রেওয়াএত জাল হইবে? বরং এমাম আবুইউছফের ভুলিয়া যাওয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যদি পণ্ডিত ছাহেব উহা অস্বীকার করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত ঘটনায় বুঝা যায় যে, হজরত জৌনপুরী মাওলানা একজন সত্যপরায়ণ খোদাভীরু হাদী আলেম ছিলেন, যদি তিনি বর্ত্তমান যুগের দাম্ভিক আলেমগণের ন্যায় হইতেন, তবে উক্ত

হাফেজকে নওয়াখালী হইতে তাড়াইয়া দিতেন।

স্বয়ং উক্ত মাওলানা শরহে-জজারির ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

یہ خاکسار آپ بھی اس غلط خوانی اور تحریف کلمات قرآنی کی بلا میں اگر قصدا نہ نہیں گرفتار تھا ۔ حروف کی تجوید اور قرآن کی تحسین نہیں جانتا تھا اور جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں بارے الحمد للہ کہ ازل کی توفیق کے سبب سے اپنی غلط خوانی پر مطلع ہوا اور اپنی ناواقفی پر شرمندہ اور پشیمان ہوا اور تجوید کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو واجب جانا تب ایک مدت دراز تک اس کے سیکھنے اور تحقیق کرنے میں کمر ہمت کی باندھی اور دن رات کی محنت کو اپ نے اوپر برداشت کر لیا اور عرب کے قاریوں کی صحبت کو اختیار کیا خصوصاً قاری اور مجود قرآنی حضرت سید محمد اسکندرانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں داخل ہو کے دو اڑھائی برس تک اس جناب سے تجوید سیکھتا رہا اور اس سبحانہ نے محض اپ لے کرم اور فضل سے جس قدر مقدور تھا اس قدر اس علم کا حصہ دیا ٭

" এই খাকছার নিজে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ভুল পড়ার ও কোরাণ শরিফের শব্দগুলি বিকৃত করার বিপদে সংলিপ্ত ছিল। অক্ষরগুলির তজবিদ ও কেরাতের সৌন্দর্য্য করন অবগত ছিল না, আর জানিত যে আমি জানি। খোদাতায়ালার প্রশংসা একবার আজলের তওফিকে নিজের ভুল পড়ার সংবাদ অবগত হইল, নিজের অনবগত থাকার জন্য লজ্জিত হইল, তজবিদ শিক্ষা করা এবং উহার উপর আমল করা ওয়াজেব জানিল, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উহা শিক্ষা করিতে ও তদন্ত করিতে দৃঢ় চেষ্টায় রত হইল এবং রাত্র দিবার পরিশ্রম করিতে নিজে সহ্য করিয়া লইল এবং আরবের কারিদের সঙ্গলাভ অবলম্বন করিল, বিশেষতঃ কারি ও কোরাণের তজবিদকারি হজরত সৈয়দ মোহাম্মদ এস্কেন্দারানির (রঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক দুই আড়াই বৎসর উক্ত জনাবের নিকট তজবিদ (কেরাতের নিয়ম) শিক্ষা করিত এবং আল্লাহ্ পাক নিজের বিশুদ্ধ দয়া অনুগ্রহে যে পরিমাণ অদৃষ্ট লিখিত ছিল সেই পরিমাণ উক্ত এলমের অংশ বিতরণ করিল এবং আজমি কথা ও শব্দকে আরবি কথা ও শব্দের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। আলহামদোলিল্লাহ।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্বয়ং জৌনপুরী হজরত নিজের কোরাণ ভুল পড়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মহত্বের লক্ষণ।

আর আমি লিখিয়াছি যে, তিনি রায়পুরাতে এক মাস কতকগুলি লোককে তরিকত শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু মুরিদগণের স্ত্রীলোকদিগের পর্দ্দা না থাকার জন্য ও হারামখুরির জন্য তাহাদের উপকার হয় নাই, ইহা স্বয়ং মাওলানা ছাহেব ভিন্ন ভিন্ন কেতাবে লিখিয়াছেন।

তিনি জাদোত্তাক্ওয়ার ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اس ملک میں اس زمانہ میں لوگ پہلی طہارت
نی نفس کی طہارت حاصل نکرنے سے اور دوسری

ـهارت يعني زكوة نديئے او ر مال كي طهارت نكرے سے
ں نعمت سے محروم رهتے هيں يعنى جبتك يه سب
ہارت حاصل نهوگي تب تک محروم رهيں گی او
لامت او ر ذکر فائدہ نکريگی جيسا که جب تک بلر
وئيں سے نه نکال پهينکيں گے تب تک ساتھ ڈول پانی
کهينچنا فائدہ نکريگا *

" এই দেশে এই জামানাতে লোকেরা প্রথম প্রকার নছফের পাকি (কোফর, শেরক, বাতীল আকিদা, মন্দ নিয়ত, হিংসা, ফেরেববাজি, অহঙ্কার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব হইতে পাকি) হাছেল না করার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার পাকি হাছেল না করার জন্য অর্থাৎ জাকাত না দেওয়ার জন্য ও মাল পাক না করার জন্য এই নেয়া'মত (তরিকত মা'রেফাত) হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায় অর্থাৎ যত দিবস এই সমস্ত পাকি হাছেল না হয়, তত দিবস বঞ্চিত থাকিবে ও এবাদত জেকরে ফলোদয় হইবে না, যেরূপ যত দিবস বিড়াল কুঙা হইতে নিক্ষেপ না করে, ততদিন ৬০ ডোল পানি উঠাইলেও ফলোদয় হইবে না।"

আরও তিনি জাদোত্তাক্ওয়ার ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اپ نے پيٹ کے کام ميں غور کرے که وه الله کے گناه
حرام کهانے پينے ميں گرفتار تو نهيں هے اگر شايد اسکو
حرام لقمه کهانے ميں گرفتار پاوے تو جانے که حرام
لقمه کهاکے ساری عبادت ضائع هوتی هے او ر اکل حلال
ساری عبادتوں کی جڑ هے *

" নিজের উদরের কার্য্যে চিন্তা করিবে যে, উহা আল্লাহতায়ালার নাফরমানি হারাম পানাহারে লিপ্ত নহে ত ? যদি উহাকে হারাম ভক্ষণে সংলিপ্ত পায়, তবে জানিবে যে, হারাম ভক্ষণে সমস্ত এবাদত নষ্ট হইয়া যায় আর হালাল ভক্ষণ সমস্ত এবাদতের মূল "।

আরও তিনি তাজকিয়াতোচ্ছেছা কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

" আমি লোকদিগকে তা'লিম তাওয়াজ্জোহ দিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় আমি ইহার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম, তখন আমার অন্তরে এলহাম হইল যে, তাহাদের স্ত্রীদিগের পর্দ্দা না থাকার জন্য ও নফছের কোফর, শেরেক, দোষ হিংসা, গিবত, মন্দ কথা, আকিদা ও স্বভাব হইতে পাক না থাকার জন্য কোন ফলোদয় হইতেছে না। "

আমি লিখিয়াছি যে, হজরত জৌনপুরী মাওলানা যে নিজের পীরের আদেশ অনুসারে মাওলানা এমামদ্দিন ছাহেবের নিকট ' ছেরাতোল-মোস্তাকিম ' বুঝিয়া লইয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজেরজখিরায় কারামততের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি নিজের নফ্ছ আম্মারাকে মারিয়া মস্ত অলী হইয়াছেন।

উক্ত হজরত আকায়েদে-হাক্কা কেতাবের ২৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মনুষ্যের শরীরে ছয়টী লতিফা আছে, তন্মধ্যে একটী লতিফার নাম নফ্ছ। কোরানশরিফে ইহাকে নফ্ছে আম্মারা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার রিয়া ইত্যাদি মন্দ স্বভাবের উৎপত্তি হয়। হাদিছ শরিফে আছে, প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত একজন ফেরেস্তা ও একটী শয়তান নিয়োজিত করা হয়, এই শয়তান মন্দ কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করে, ইহাকে নফ্ছে আম্মারা বলা হয়।

মনুষ্য পরহেজগার হইলে, উহার নাম নফ্‌ছে লাওয়ামা হয়। মনুষ্য অলি হইয়া গেলে, উহার নাম নফ্‌ছে-মোতমায়েন্না হইয়া যায়। বেলাএতে-ছোগরাতে মনুষ্যের কল্‌ব লতিফা দ্বেষ-হিংসা, গরিমা, রিয়া ইত্যাদি হইতে পবিত্র হইয়া যায়। বেলাএত কোবরাতে পৌঁছিলে, এছমে-আজ্জাহেরোর ছায়ের হইয়া থাকে, ইহাতে নফ্‌ছে-আম্মারার অসৎ স্বভাবগুলি দূরীভূত হইয়া যায়, তখন বলা হয় যে, তাহার নফ্‌ছ ফানা হইয়া গিয়াছে বা মরিয়া গিয়াছে।

আরও উক্ত মাওলানা ছাহেব জখিরায় কারামতের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

" পীর কোফ্‌র, শেরক, মন্দ আকিদা, দ্বেষ-হিংসা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব হইতে মুরিদের নফ্‌ছকে পাক করিয়া দিয়া তাহাকে আল্লাহতায়ালার প্রিয়পাত্র বানাইয়া দেন। এইরূপ যতক্ষণ নফ্‌ছকে পাক না করিবে, কোন জেকর, এবাদত ও মোরাকাবা ফলোদয় হইবে না। "

আরও তিনি জখিরায় কারামতের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جیسا کہ چاھئے ویسا اس مراقبے کو ھمیشہ کرتے رھے اور اس مراقبے کے فیضون کے اترنے کے مقام مین کہ لطیفۂ نفس اصالۃ ھے اور باقی سب لطیفے بالتبع ھین جس وقت کہ اس مراقبے کے فیضون سے کما ینبغی مستفیض ھونگی یعنی جیسا کہ چاھئے ویسا انمین فیض اتریگا تب اس مراقبے کے آثار ظاھر ھونگے اور ان آثار مین سے نفس کا فنا ھونا ھے *

"যেরূপ উচিত সেইরূপ এই মোরাকাবাকে সর্ব্বদা করিতে থাকিবে, আর এই মোরাকাবার ফয়েজ প্রত্যক্ষভাবে নফছের উপর এবং প্ররোক্ষ ভাবে অন্যান্য সমস্ত লতিফার উপর পতিত হইয়া থাকে। যে সময় এই মোরাকাবার জ্যেতিতে যথোচিত আলোকিত হইবে অর্থাৎ উক্ত লতিফা সমূহে যথোচিত ফয়েজ পতিত হইবে, তখন উহার চিহ্ন প্রকাশিত হইবে এবং উক্ত চিহ্নগুলির মধ্যে একটী চিহ্ন নফছের ফানা হওয়া (মরিয়া যাওয়া)।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, বেলাএতে-কোবরাতে পরিপক্কতা লাভ হইলে, মনুষ্যের নফ্ছ-আম্মারা মরিয়া যায়, সেই সময় নফ্ছের অসৎ স্বভাবগুলি একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষ অলিয়ে-কামেল হইয়া যায়। নফ্ছ-মরা অলীর অর্থ যাহার নফছের কু-স্বভাবগুলি দূরীভূত হইয়াছে এবং যিনি পাক পবিত্র হইয়া অলী হইয়াছেন।

আমি লিখিয়াছি যে, তিনি জাহেরি শরিয়ত মযবুত করিতে গিয়া তরিকতের এলম প্রচার করিতে সুযোগ পান নাই, ইহা সত্য। তিনি নুরোল-আলো নুর কেতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ان مفسدون کے فساد کے سبب سے یہ خاکسار توجہ دینے اور مشاہدہ اور مراقبہ اور فنا اور بقا وغیرہ باتون کے بیان اور تعلیم کرنے سے باز رہتا ہے - اور برے علما کے وسواسون کا رد کیا کرتا ہے *

এই ফাছাদিদের ফাছাদের জন্য এই খাকাছার তাওয়াজ্জোহ দিতে মোরাকাবা, মোশাহাদা, ফানা, বাকা ইত্যাদি কথা বর্ণনা করিতে ও শিক্ষা দিতে বিরত রহিয়া গিয়াছে এবং মন্দ আলেমদের ওছয়াছাগুলির রদ করিয়া থাকে।

মালদহ

মালদহের পাণ্ডুয়ার বড় দরগা ও দরগা নামক দুইটী দরগা আছে, বড় দরগাতে প্রথমে হজরত শাহ জালাল তবরেজি (কোঃ) চেল্লা করিয়াছিলেন, তাঁহার চেল্লা তথাকার পোক্তা মছজিদের মধ্যে আছে। তৎপরে তাঁহার পীর হজরত, হোবদ্দিন ছাহারওয়াদ্দি ছাহেব তথার আগমন করিলে, তিনি তথায় নিজের পীরকে স্থান দিয়া নিজে উহার পূর্ব্ব পাশ্বস্থ কামরাতে চেল্লা স্থির করেন। কেহ কেহ বলেন, তথায় হজরত নুর-কোৎব-আলম ছাহেবের তৃতীয় একটী চেল্লা ও হজরত শাহ নেয়ামতুল্লা আলি ছাহেবের চতুর্থ একটী-চেল্লা আছে। উক্ত মছজেদের বারামদা ছাদ বিশিষ্ট, উহার সম্মুখে আরবিতে লিখিত আছে, এই বাহিরের ছাদটী শাহ নেয়ামতুল্লা কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে। চারিজন জবরদস্ত অলির এবাদত স্থান বলিয়া এই দরগাটীকে বড় দরগা বলা হয়। হজরত শাহ জালাল নিজ হস্তে একটী ডালিম গাছ লাগাইয়া ছিলেন, উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। তিনি নিম্বের মেছওয়াক পুতিয়া দিয়াছিলেন, উহা হইতে একটী নিম্ব গাছ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা সদর রাস্তার ধারে আছে। তিনি ছাহারওয়ারদিয়া ও চিস্তিয়া উভয় তরিকার কামেল খলিফা ছিলেন, প্রথমে তিনি শেখ আবুসইদ তবরেজির নিকট মুরিদ ছিলেন, তৎপরে তিনি এন্তেকাল করিলে, সাত বৎসর হজরত শেহাবদ্দিন ছাহারওয়ার্দ্দি ছাহেবের খেদমতে থাকিয়া কামেল হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি খাজা-মইনদ্দিন চিস্তি ও খাজা কোৎবদ্দিন বখতিয়ার কাকির খেদমতে চিস্তিরা তরিকার খলিফা হইয়াছিলেন। যখন হজরত শেখ শেহাবদ্দিন ছাহারওয়ার্দ্দী ছাহেব হজ্জে যাইতেছিলেন, শেখ জালালদ্দিন তবরেজি সঙ্গে ছিলেন, ইনি এরূপ একটা উনান প্রস্তুত করিলেন যে, উহা অগ্নিপূর্ণ অবস্থায় মস্তকের উপর রাখিলেও যেন উহার তাপ মস্তিষ্কের মধ্যে সংক্রামিত না হয়। উক্ত উনানে গরম খাদ্যের ডেগ নিজের পীরের জন্য প্রস্তুত রাখিতেন,

যখনই পীর ছাহেব খাদ্য সামগ্রী তলব করিতেন, তিনি গরম ও তাজা খাদ্য খেদমতে উপস্থিত করিতেন। শেখ আওহাদোদ্দিন কেরমানি বলিয়াছেন, আমি এক সময় কাবাতুল্লাহর ছফরে শেখ জালালউদ্দিন তবরেজির সঙ্গে ছিলাম, যখন তিনি বনি-লামের ময়দানে উপস্থি হইলেন, পথটী এরূপ দুর্গম ছিল যে, আমরা পদব্রজে চলিতে অক্ষকম হইয়া পড়িলাম। এমতাবস্থায় সওদাগরেরা বহু সংখ্যক উট বিক্রয় করা উদ্দেশ্যে আনয়ন করিয়াছিল এবং প্রত্যেক উটের মূল্য ২০ আশরফি স্তির করিয়াছিল। যাত্রিদিগের মধ্যে অর্থশালিরা উট ক্রয় করিয়া লইল, অবশিষ্ট লোকেরা প্রাণের মমতা ত্যাগ করতঃ পদব্রজে চলিতে লাগিল। হজরত জালালদ্দিন এই অবস্থা দেখিয়া উটগুলির বিষব জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আরও পাঁচশত উট সওদাগরদিগের নিকট মওজুদ রহিয়াছে। তখন তিনি রন্ধনশালা হইতে একটী ডেগ তলব করিয়া উহার মধ্যে একটী স্বর্ণ-মুদ্রা (আশ্‌রাফি) রাখিলেন এবং উহার মুখটা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া প্রত্যেক বারে ইয়া লতিফো পড়িয়া নিজের পাক হস্ত ডেকের মধ্যে রাখিতে লাগিলেন ও কুড়ি কুড়ি আশরফি বাহির হইতেছিল, এইরূপ ৫ শত উটের মূল্য দিয়া তৎসমুদয় খরিদ করিয়া দলের লোকদিগকে দান করিলেন। তাহারা উটের উপর আরোহণ করিল, আর পীর ছাহেব পদব্রজে চলিতে লাগিলেন।

হজরত জালাল (রঃ) বাদাউনে দহলিজে বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় একজন হিন্দু গোয়ালা তথায় উপস্থিত হইল, পীর সাহেবের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হওয়া মাত্র সে কলেমা পড়িয়া মুছলমান হইয়া গেল। তিনি তাহার নাম আলি রাখিয়া ছিলেন। সে বাটীতে গিয়া তাহার সমস্ত স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত করিয়া বলিল, আমি এই সমস্তের স্বত্ব ত্যাগ করিলাম। আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করেন, ব্যায় করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, তুমি এই

অর্থগুলি রক্ষণাবেক্ষণ কর, আমি যে স্থানে বলিব, তুমি ব্যয় করিবে। তিনি তৎসমস্ত লোকদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। যাহাকে তিনি দান করিতেন, ১০ টাকার কম দান করিতেন না, যখন আলির নিকট এক টাকা বাকি থাকিল, তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যদি পীর সাহেব কোন লোককে দশ টাকা দান করিতে বলেন, তবে আমি কোথা হইতে উহা সংগ্রহ করিব। এই অবস্থায় একজন ভিক্ষুক উপস্থিত হইল, পীর ছাহেব বলিলেন, হে আলি, তোমার নিকট যে একটা টাকা বাকি আছে তাহা এই ভীক্ষুককে প্রদান কর। যখন পীর সাহেব বাদাইউন হইতে বাঙ্গালার দিকে রওয়ানা হইতে ইচ্ছা করিলেন, নব ইছলামধারি আলি রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। তিনি বলিলেন, হে আলি, তুমি ফিরিয়া যাও। সে বলিল, আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া এই স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করি না। পীর ছাহেব বলিলেন, তুমি যাও আমি তোমাকে এই স্থানটী সমর্থন করিলাম এবং তোমাকে এই শহরের কোতব নির্দ্দেশ করিলাম। আমি প্রত্যেক সময় তোমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিব, আমার এবং তোমার মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিবে না। ঘটনা তাহাই হইল, আলি জামানার কোতব হইয়া গেল এবং যে সময় ইচ্ছা করিত পীরকে নিজের সাক্ষাতে উপস্থিত পাইত।

জাওয়া-মেয়োল-কামেল কেতাবে আছে, শেখ ফরিদউদ্দিন বাল্যকালে অনেক সময় জেকর মোরাকাবায় আত্মহারা অবস্থায় থাকিতেন। এই হেতু লোকে তাঁহাকে কাজি পুত্র উন্মাদ বলিত। একবার শাহ জালাল তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্থানে কোন দরবেশ আছে কি? তদুত্তরে লোকে বলিল, একটি বালক উন্মাদের ন্যায় জামে মছজেদে পড়িয়া থাকে। শাহ জালাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাঁহার হস্তে একটী ডালিম প্রদান করিলেন, তিনি রোজাদার ছিলেন, তিনি উহা লোকদিগকে বিতরণ করিয়া

দিলেন, কেবল একটি দানা পড়িয়াছিল, এফতারের সময় উহা দ্বারা রোজা খুলিলেন, সেই দিবস আত্মিক উন্নতি শত গুণ বেশী হইল, ইহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, যদি সমস্ত ডালিমটী খাইতাম, তবে আরও কি কি উন্নতি সাধিত হইত। যখন তিনি শায়খোল-ইছলাম কোতবদ্দিন কিম্বা তাঁহার নিকট এই দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই দানাটীর মধ্যেই ফয়েজ গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল।

শাহ জালাল ও কাজি কামালদ্দিন জাফরির মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, এক সময় শাহ সাহেব কাজি সাহেবের গৃহে উপস্থিত হইলেন, কাজি সাহেব নামাজ পড়িতেছিলেন, তিনি তাঁহার খাদেমগণের নিকট কাজি ছাহেবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, তিনি নামাজে আছেন। শাহ ছাহেব বলিলেন, তোমাদের কাজি নামাজ পড়িতে জানেন। ইহা বলিয়া তিনি নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিবস কাজি ছাহেব তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া গত কল্যকার কথার অনুযোগ করিলেন। শাহ সাহেব বলিলেন, হাঁ, দরবেশগণের নামাজের প্রথম দরজা এই যে, চর্ম্ম-চক্ষে কা'বা না দেখিয়া প্রথম তকবির বলেন না। উচ্চ দরজা এই যে, আরশের উপর নামাজ পড়েন। যদি আপনার এই অবস্থা হইয়া থাকে, তবে আপনি নামাজ পড়িতে জানেন, নচেৎ না, কাজি সাহেব ইহা শুনিয়া অন্তরে রাখিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে কাজি ছাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, শাহ জালাল আরশের উপর নামাজ পড়িতেছেন। প্রভাতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং নিজের পুত্র ছয়ফদ্দিনকে তাঁহার নিকট মুরিদ করাইয়া লইলেন। খাজা বাহাউদ্দিন জিকরিয়া মোলতানি ও শাহ জালালদ্দিন তবরেজি উভয়ে একত্রে বিদেশ ভ্রমণ করিতেন, যে শহরে শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার বাস করিতেন, তথায় উভয়ে উপস্থিত হইলেন, শেখ বাহাউদ্দিন এবাদতে নিমগ্ন ছিলেন, শাহ জালাল দুধ আনার জন্য

শহরে উপস্থিত হইলেন, যখন তিনি শেখ ফরিদউদ্দিনের খানকার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহার কামালাতের জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি বাসস্থানে ফিরিয়া আসিয়া শেখ বাহাউদ্দিন সাহেবকে বলিলেন, অদ্য একটী বাজ পক্ষীকে দেখিলাম, তাঁহার কামালিএত বিশিষ্ট চেহারা দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। শেখ বাহাউদ্দিন বলিলেন, সেই সময় আপনি নিজের পীরের কামালিএতের নুরের কথা স্মরণ করিয়াছিলেন কিনা ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার জামালের জ্যোতিতে এইরূপ আত্মহারা হইয়াছিলাম যে, কাহারও কথা আমার স্মরণে ছিল না। শেখ বাহাউদ্দিন তাঁহার এই কথা না পছন্দ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। যখন শাহ জালাল তবরেজি দিল্লীতে শুভাগমন করিলেন, সুলতান শামছুদ্দিন আলতামাছ তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইবার জন্য বাহির হইলেন। সেই জামানায় দিল্লীর শায়খোল-ইছলাম শেখ নজমোদ্দিন ছোগরা সুলতানের সঙ্গী ছিলেন। সুলতান শাহ সাহেব দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পদ ব্রজে ধাবিত হইলেন। যখন তিনি শহরে প্রবেশ করিলেন, সুলতান শায়খোল-ইছালামকে বলিলেন, পীর সাহেবের বাসস্থান এরূপ স্থানে স্থির কর—যাহা আমার বাসস্থানের সমধিক নিকটবর্ত্তী হয়। তৎশ্রবণে নজমদ্দিন ছোগরার বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, রাজপ্রসাদের পার্শ্বেই জ্বেনের গৃহ নামক একটী রুদ্ধ গৃহ ছিল, উহাতে জ্বেনের দল অবস্থিতি করিত। তিনি বলিলেন, যদি সুলতানের অনুমতি হয়, তবে পীর সাহেবের জন্য জ্বেনের গৃহ বাসস্থান স্থির করিতে পারি, কেননা যদি তিনি অলী হন, তবে কোন কষ্ট পাইবেন না; আর যদি জাল দরবেশ হন, তবে শাস্তিগ্রস্থ হইবেন। সুলতান উহার উত্তর দিয়াছিলেন না। এমতাবস্থায় হজরত পীর সাহেব নুরে বাতেনি দ্বারা অবগত হইয়া বলিলেন, সত্বর জ্বেনের রুদ্ধ গৃহের কুঞ্চিকা আনয়ন কর। কুঞ্চিকা লইয়া তিনি খাদেম (তোরাব আলি মিএা) কে বলিলেন, তুমি উক্ত গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বল হে এই গৃহের

অধিবাসিগণ্ এক্ষণে শেখ জালালদ্দিন তবরেজী এই গৃহে আসিতেছেন, তোমরা অন্যস্থানে গমন কর এবং তিনি নিজে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন। সুলতানের নিকট শাহ সাহেবের পদ মর্য্যদা অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে দেখিয়া শায়খোল-ইছলামের দ্বেষ-হিংসার মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এমনকি তিনি শাহ ছাহেবের উপর কোন অপবাদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা হানি করার সুযোগ অনুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হইলেন। এক দিবস শাহ সাহেব ফজরের নামাজ অন্তে মুখ ঢাকিয়া চার পাইর উপর শয়ন করিয়াছিলেন, একটী সুন্দর তুর্কি গোলাম তাঁহার পা টিপিতেছিল। সেই সময় শায়খোল-ইছলাম তাঁহাকে সেই অবস্থায় শাহি অট্টালিকার উপর হইতে দেখিয়া সুলতানের হাত নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আপনি এইরূপ লোকের উপর ভক্তি রাখেন যে, তিনি এই সময় নিদ্রিত আছেন—যাহা শরিয়তে নিষিদ্ধ এবং সুন্দর একটী গোলাম তাঁহার পা টিপিতেছে, ইহা যে নফছের কু-কামনা হইতে শূন্য হইবে, ইহা জ্ঞান স্বীকার করিবে কেন ? শাহ সাহেব নুরে-বাত্তিন দ্বারা অবগত হইয়া মুখের চাদর খুলিয়া এরূপ উত্তর দিলেন যে, তাহাতে শায়খোল-ইছলাম লজ্জিত হইলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার উপর মস্ত অপবাদ প্রয়োগ করিয়া সুলতানের নিকট অভক্তির পাত্র করিয়া ফেলিবেন ধারনায় শহরের একটী সুন্দরী সঙ্গীত - কারিণী বেশ্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি তুমি সুলতানের নিকট বলিতে পার যে, শাহ জালাল তোমার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, তবে আমি তোমাকে ৫ শত সোনার মোহর প্রদান করিব। আড়াই শত মোহর অগ্রিম তাহাকে প্রদান করিলেন, আর আড়াই শত স্বর্ণ-মুদ্রা মুদিখানার দোকানদার আহমদ নামিয় একটা লোকের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন, এই কার্য্য সমাধা করিয়া সে উহা লইবে। শায়খোল ইছলাম সেই স্ত্রীলোকটীকে সুলতানের নিকট উপস্থিত করিয়া উক্ত অপবাদ প্রকাশ করাইলেন। সুলতান বলিলেন, তুমি নিজের একবারের জন্য শাস্তির উপযুক্ত হইয়াছ,

কিন্তু হজরত শাহ সাহেবের পক্ষে এই দোষ প্রমাণিত হয় নাই, এখন অন্য বিচারকের দ্বারা ইহার বিচার করা হইবে। এসম্বন্ধে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, এই কথা তদন্ত করার জন্য একটা বিরাট মজলিশে বড় বড় পীর দরবেশকে সংগ্রহ করিয়া যাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহাকেই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। যেহেতু শাহ জালাল ও তাঁহার পীর ভাই শেখ বাহাউদ্দিন মোলতানির মধ্যে মোনমালিন্য ঘটিয়াছিল, এইহেতু শেষোক্ত হজরত শায়খোল ইছলামের পক্ষ সমর্থন করতঃ হুকুম দিবেন ধারণায় ইনি এই ব্যাপারে তাঁহাকে শালিষ স্থির করিলেন। হজরত পীর বাহাউদ্দিন মুলতান হইতে রওয়ানা হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। জোহরের নামাজের পরে সমস্ত পীর বোজর্গ জামে-মছজিদে উপস্থিত হইলেন, শেখ নজমদ্দিন সঙ্গীত-কারিণী স্ত্রীলোককে উপস্থিত করিলেন, একজন খাদেমকে শাহ জালাল ছাহেবকে ডাকিতে পাঠাইলেন, যখন তিনি মছজেদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পা হইতে জুতা খুলিলেন, সমস্ত পীর বোজর্গ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য ধাবিত হইলেন, পীর বাহাউদ্দিন জিকরিয়া শাহ জালালের জুতা হাতে উঠাইয়া বোগলে করিয়া লইলেন, তৎপরে সভাস্থ লোকেরা বিষ্ময়ান্বিত হইলেন। পীর বাহাউদ্দিন বলিলেন, যেহেতু ইনি আমার পীরান পীর শেহাবদ্দিন ছাহারওয়ার্দ্দীর সঙ্গে দেশবিদেশে সাত বৎসরের সহচর ছিলেন, কাজেই আমার পক্ষে ওয়াজেব যে, আমি হজরতের জুতার ধুলিতে নিজের চক্ষের সুরমা করিয়া লই। তৎপরে তিনি

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

এই

পড়িয়া সঙ্গীত-কারিণী স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি সমস্ত অবস্থা সত্য সত্য বল, নচেৎ তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে। সে উচ্চশব্দে বলিল, আল্লাহ হাজের-নাজের, আমি শেখ নজমদ্দিনের প্ররোচনায় ও পাঁচশত সোনার মোহরের লোভে শাহজালালের উপর মিথ্যা

অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছি। ইহার অর্দ্ধেক মোহর আমি লইয়াছি, আর অর্দ্ধেক আহম্মদ দোকানদারের নিকট গচ্ছিত আছে। তৎক্ষণাৎ আহম্মদকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল। সে বলিল, শেখ নজমদ্দিন সঙ্গীতকারিণীকে দিবার জন্য আড়াইশত মোহর আমার নিকট জমা রাখিয়াছিলেন, এখনও উহা আমার নিকট জমা আছে। শেখ নজমদ্দিন নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পীর বাহাউদ্দিন জিকরিয়াকে সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর শাহ জালাল দিল্লী ত্যাগ করিয়া বাদাউনে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান স্থির করিলেন, কয়েক দিবস পরে তিনি নদীর ধারে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া তাজা ওজু করিয়া বলিলেন, হে দরবেশেরা, আসুন শেখ নজমদ্দিনের জানাজা পড়ি, তিনি দিল্লীতে এই সময় এন্তেকাল করিয়াছিন। নামাজ অন্তে তিনি বলিলেন, আমি যাহার অপবাদের জন্য দিল্লী হইতে বাহির হইলাম, তিনি বড় বড় পীরের কোপে পড়িয়া দুনইয়া হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক দিবস পরে সংবাদ পৌঁছিল যে, শাহজালালের কথিত সময়ে নজমদ্দিন ছোগরা এন্তেকাল করিয়াছেন।

তৎপরে হজরত শাহজালাল (রঃ) বঙ্গদেশে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া নামক স্থানে শুভাগমন করেন। সেই দেশের বহু লোক তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইতেন। তিনি তথায় একটী খনিকা প্রস্তুত করাইয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন। কয়েকটী উদ্যান ও কিছু জমি খরিদ করিয়া খাদেমগণ, খাস ও আম সকলের জন্য লঙ্গর খানা অক্‌ফ করিয়া দিলেন, সহস্র সহস্র দেশী ও বিদেশী লোক তথা হইতে খাদ্য পাইতেন। তথায় একটী প্রাচীন প্রতিমালয় ছিল, তিনি নিজের কারামত দ্বারা প্রতিমাগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং সেই স্থানে একটী মছজেদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং পৌত্তলিকদিগকে মুছলমান করিলেন। তথায় তাঁহার গোর আছে।

ইহা খজিনাতোল-আছফিয়া ও আখইয়ারোল আখইয়ারের বর্ণনা।

আমি উক্ত মছজেদে হজরত শাহ জালালের ঝাণ্ডা ও নিশানা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহার চেল্লাতে বিস্ময়কর ফয়েজ জারি হওয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। রেয়াজোছ-ছালাকিনে আছে, হজরত শাহ্ জালাল তবরেজি পাণ্ডুয়াতে পৌঁছিলে তথাকার রাজা লক্ষণ সেন ও রাণী তাঁহার কারামতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে বহু জায়েদাদ লাখেরাজ দিতে চাহিলে, তিনি হিন্দু রাজার দান লইতে অস্বীকার করিয়া বলেন, আপনি কিছু মুল্য লইয়া আমার নিকট জায়েদাদগুলি বিক্রয় করুন। রাজা তহাই করিলেন, তৎপরে তিনি উক্ত জায়দাদ খোদার পথে অকৃফ করিয়া দিয়া উক্ত রাজাকে এই সম্পত্তি মোতাওয়াল্লি স্থির করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পাণ্ডুয়ার খাদেমেরা বলেন, তাঁহার মাজার এস্থানে নাই, কোন পাহাড়ে রহিয়াছে। সত্য মত এই যে, তাঁহার মজার আসামের কোন পাহাড়ে আছে।

দুনইয়া পরিব্রাজক এবনো-বতুতা " তোহফাতোন্নাজার " কেতাবের ২য় খণ্ডের ১৮০/১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

আমি (সপ্তগ্রাম) হইতে কামরূপ পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলাম, কামরূপ ও (সপ্তগ্রাম) উভয় স্থানের মধ্যে এক মাসের পথ ব্যবধান। কামরূপ পাহাড় চীন ও তিব্বতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, তথাকার লোকেরা জাদু বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত, আমি কামরূপ পাহাড়ে একজন অলিউল্লাহ ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভের জন্য গিয়াছিলাম, তাঁহার নাম পীর জালালদ্দিন তবরেজি। তিনি মস্ত অলী ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বহু কারামত ও স্মৃতি চিহ্ন প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তিনি বগ্দাদের আব্বাছি খলিফা মো'তাছেম বিল্লাহকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার হত্যা সাধনের সময় ইনি বগ্দাদে ছিলেন। ইহার পরে তাঁহার

শাগরেদগণ আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি ১৫০ বৎসর একাদিক্রমে রোজা রাখিতেন, দশ দিবস পরে রোজার এফতার করিতেন, তাঁহার একটা গাভী ছিল, তিনি উহার দুধে এফতার করিতেন, সমস্ত রাত্রি এবাদত করিতেন, তিনি লম্বা দুর্ব্বলকায় ছিলেন, তাঁহার দাড়ী অল্প ছিল, তাঁহার হস্তে পাহাড়িরা মুছলমান হইয়াছিল, এই হেতু তিনি তাহাদের মধ্যে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন শাগরেদ বলিয়াছেন তিন এন্তেকালের এক দিবস পূর্ব্বে মুরিদগণকে ডাকিয়া আল্লাহকে ভয় করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, আমি খোদা চাহেত কল্য তোমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, যে আল্লাহ এক মাত্র বন্দিগীর যোগ্য তিনিই তোমাদের উপর আমার খলিফা। পর দিবস তিনি জোহরের নামাজ পড়িতেছিলেন, উহার শেষ ছেজদাতে খোদা তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন। তিনি যে গর্ত্তে বাস করিতেন, উহার এক পার্শ্বে তাহার একটা খনন করা গোর, কাফন ও খোশবুদার বস্তু দেখিতে পাইলেন, তৎপরে তাঁহাকে গোছল ও কাফন দিয়া জানাজা পড়িয়া দফন করিলেন, খোদার রহমত তাঁহার উপর বর্ষিত হউক।

এবনো-বতুতা বলিয়াছেন, আমি হজরত শাহ জালালের সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হইলে, দুই দিবসের পথ দুর থাকিতে তাঁহার সঙ্গীর চারি জন দরবেশের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা আমাকে বলিলেন, পীর ছাহেব সঙ্গী দরবেশগণকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের নিকট পশ্চিম দেশীয় দেশপর্য্যটক একজন লোক আগমন করিতেছেন, তোমরা তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আন, এই হেতু তাহারা পীরের হুকুম অনুসারে আসিয়াছেন, আমার আগমন সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংবাদ ছিল না, কিন্তু কাশফ দ্বারা তিনি ইহা অবগত হইয়াছিলেন। আমি তাহাদের সঙ্গে পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া গর্ত্তের বাহিরের পুর্ণ কুটিরে প্রবেশ করিলাম,

তথায় কোন পোক্তা দালান ছিল না, অধিবাসিরা মুছলমান হউক, আর কাফের হউক, তাঁহার জিয়ারত করিতে আসিতেন, উপঢৌকন ও তোহফা আনয়ন করিতেন, ফকিরেরা ও আগন্তুকেরা তৎসমস্ত ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু পীর ছাহেব দশ দিবস পরে গাভীর দুগ্ধ দ্বারাই এফতার করিতেন। আমি যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থি হইলাম, তিনি দাঁড়াইয়া আমার সহিত গলা মিলাইয়া আমার দেশ ও দেশভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উহা উত্তর দিলে, তিনি বলিলেন, তুমি আরবের অতিথী। ইহাতে তাঁহার সঙ্গিগণ বলিলেন, হে আমাদের ছৈয়দ, আজমের পর্য্যটক। তিনি বলিলেন, আজমের পর্য্যটক, তোমরা তাঁহার সম্মান কর, তখন তাহারা আমাকে লইয়া তিন দিবস জেয়াফত খাওয়াইলেন।

আমি যে দিবস তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাঁহার শরীরে পশমী চোগা দেখিয়া উহা পছন্দ করিলাম এবং মনে মনে বলিলাম, যদি পীর ছাহেব আমাকে উহা দান করিতেন, তবে ভালই হইত। যখন আমি বিদায় গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া চোগাটী খুলিয়া আমাকে উহা পরিধান করাইলেন, উহার সঙ্গে নিজের মস্তকের রুমাল ও তালি দেওয়া কাপড় দিলেন। দরবেশেরা আমাকে বলিলেন, পীর ছাহেব উক্ত চোগা ব্যবহার করিতেন না, আপনার আগমন কালে তিনি উহা পরিধান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, একজন মগরেববাসি উহা চাহিবে, একজন কাফের বাদশাহ তাহার নিকট হইতে উহা লইয়া আমার ভ্রাতা বোরহানদ্দিন ছাগেরজীকে প্রদান করিবে, ইহা তাহার জন্য হইয়াছে। দরবেশদিগের এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, পীর ছাহেব আমাকে উহা পরিধান করাইয়াছেন, ইহাতে আমার পক্ষে বরকত লাভ হইয়াছে, আমি এই চোগা ব্যবহার করিয়া কোন কাফের কিম্বা মুছলমান বাদশার নিকট উপস্থিত হইব না। আমি তাঁহার নিকট

হইতে রওয়ানা হইলাম। অনেক দিবস পরে ঘটনাক্রমে আমি চীন দেশে উপস্থিত হইয়া খানছা শহরে প্রবেশ করিলাম, অতিরিক্ত জনতার জন্য আমার সঙ্গিরা আমা হইতে পৃথক হইয়া পড়িল, চোগাটা আমার পরিধেয় ছিল, আমি কোন পথে গমন করিতেছিলাম, হঠাৎ মন্ত্রী বিরাট সৈন্যদল সহ যাইতেছিলেন, তাহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল, তিনি আমাকে ডাকিয়া আমার হাত ধরিয়া আমার আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, যতক্ষণ না বাদশার দরবারে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে ছাড়িলেন না। আমি চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন এবং আমাকে বাদশার নিকট উপস্থিত করিলেন। তিনি আমার নিকট মুছলমান বাদশাহদিগের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উহার উত্তর দিলাম, তিনি আমার চোগার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা পছন্দ করিলেন। মন্ত্রী আমাকে উহা খুলিয়া দিতে বলিলেন, উহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। তিনি উহা লইয়া আমার জন্য দশটী মূল্যবান কাপড়, সজ্জিত ঘোড়া ও পাথেয় প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে আমার মন চঞ্চল হইয়া পড়িল, তৎপরে আমি সেই পীর ছাহেবের কথায় উহা একজন কাফের বাদশাহ লইবে স্মরণ করিলাম। পীর ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অনেক দিবস আশ্চর্য্য অনুভব করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় বৎসরে আমি চীনের বাদশাহ বোখান বালেকের দরবারে উপস্থিত হইয়া পীর বোরহানদ্দিন ছাগেরজীর খানকাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি কোর-আন পড়িতেছেন, অবিকল সেই চোগাটী তাঁহার পরিধেয় দেখিয়া অবাক্ হইতেছিলাম এবং নিজের হাতে উহা উল্‌টাইতে ছিলাম, তিনি বলিলেন, তুমি উহা উল্‌টাইতেছ কেন ? তুমি উহা চিনিয়াছ ? আমি বলিলাম, হাঁ খানছাব্ বাদশাহ উহা আমার নিকট হইতে লইয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আমার ভ্রাতা জালালদ্দিন আমার মাপে উহা প্রস্তুত

করিয়াছিলেন এবং আমার নিকট পত্র দিয়াছিলেন যে, চোগাটী অমুকের হস্তে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তৎপরে তিনি পত্রখানা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন, আমি উহা পড়িয়া পীর ছাহেবের বিশাসের সত্যতার জন্য অবাক্ হইতেছিলাম এবং প্রথম হইতে ঘটনাটী তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, আমার ভ্রাতা জালালদ্দিন এই সমস্ত অপেক্ষা সমধিক বোজর্গ। তিনি কার্য্যকলাপ পরিচালনে শক্তিশালী ছিলেন, তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন। আমি অবগত হইয়াছি, প্রত্যেক দিবস তিনি মক্কা শরিফে ফজর পড়িতেন এবং প্রত্যেক বৎসর হজ্জ্ব করিতেন, কেননা তিনি আরফা ও ঈদের দিবস লোকদিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। লোকেরা জানিতে পারিত না যে, তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত এবনো বতুতার বর্ণনা ঃ—

আমি যে সময় পাণ্ডুয়ার ছোট দরগা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তথাকার মছজেদের এমাম হাফেজ ছাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, একজন ভক্তি-ভাজন দেশ পর্য্যটক তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, হজরত শাহজালাল ছাহেবের মাজার চৌখা পাহাড়ে আছে, স্বয়ং হজরত শাহ জালাল ছাহেব তাঁহাকে স্বপ্নযোগে নিজের গোরের নিদর্শন অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানটি গৌহাটী হইতে ১৩ মাইল দূরে, ১০ মাইল মোটরে ও ৩ মাইল পদব্রজে যাইতে হয়। সেই স্থানে অন্যান্য কয়েকটী কবর আছে, তথায় পাহাড়িদিগের বাস, তাহারা উক্ত গোরের উপর দুধ ঢালিয়া থাকে, শাহ ছাহেব বারমাস রোজা রাখিতেন, দশ দিবস অন্তর নিজের পালিত গাভীর দুধ দ্বারা এফ্তার করিতেন, এই হেতু বোধ হয় পাহাড়িরা তাঁহার গোরে দুধ ঢালিয়া থাকে। খোদা যেন এইরূপ বোজর্গের জিয়ারত আমার নছিব করুন।

ছোট দরগাতে বহু অলী ও বোজর্গের গোর আছে, প্রথম আলাওল-হক উদ্দীন ছাহেবের মাজার পোক্তা গোম্বজের মধ্যে

আছে। আখাবোর - আখইয়ারে আছে, পীর ছেরাজদ্দীন আখি ছেরাজ সুলতানোল মাশায়েখ হজরত নেজামদ্দীন আওলিয়ার নিকট হইতে খেলাফত লইয়া বিদায় কালে তাঁহার নিকট আরজ করিলেন, হুজুর, আমাদের দেশে আলাউদ্দীন নামক একজন জ্ঞানী ও অতি সম্ভ্রান্ত লোক আছেন, আমি তাহার সহিত সমকক্ষতা করিতে ও কথা বলিতে সাহস করি না। তিনি বলিলেন, তুমি চিন্তা করিও না, সে ব্যক্তি তোমার মুরিদ হইবে, ঘটনা তাহাই হইল।

মায়ারেজোল-বেলায়েত কেতাবে আছে, শেখ আলাউদ্দীন হাশিমি শরিফ ছিলেন, তাঁহার বংশাবলী হজরত খালেদ বেনে অলিদ (রঃ)র সহিত মিলিত হয়। পীর ছেরাজদ্দীন দেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বে শেখ আলাউদ্দীন ধন দৌলতের লোভে মত্ত হইয়া নিজেকে গাঞ্জে-নাবাত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, হজরত নেজামদ্দীন আওলিয়া ইহা শ্রবণে রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, আমার পীরের উপাধি গঞ্জে-শাকার, আর সেই ব্যক্তি নিজেকে গঞ্জে-নাবাত নামে অভিহিত করিয়া নিজেকে আমার পীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধারণা করিয়াছে। খোদা তুমি তাহাকে বোবা করিয়া দাও। বোবা হইয়া গেলনে। যখন তিনি হজরত আখি ছেরাজি (রঃ)র নিকট মুরিদ হইলেন, তিনি বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি এবাদত বন্দেগীতে এরূপ কঠোর সাধ্য সাধনা করিলেন যে, মির সৈয়দ আশ্‌রাফ জাহাঁগির ছামনানি বাহ্য রাজত্ব ত্যাগ করতঃ হজরত খেজের (আঃ)এর উপদেশ মত তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া কামেল হইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র ও খলিফা হজরত নরদ্দীন কোতবোল আলম তাঁহার তাওয়াজ্জহে দুনইয়ার কোতব হইয়া গেলেন এবং মহা বোজর্গ পীর নছিরদ্দীন মানেকপুরী তাঁহার মুরিদগণের অন্তর্গত হইয়া গেলেন। খোদা তাঁহাকে আবদালী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন।

যখন তিনি হজরত আখি ছেরাজের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন,

নিজের বিষয় সম্পত্তি টাকা কড়ি ও মান এজ্জত ত্যাগ করতঃ পীরের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করিলেন। পীর ছেরাজদ্দিন অনেক সময় বিদেশে থাকিতেন, রন্ধন করা খাদ্য সঙ্গে লইতেন, খাদেমেরা গরম খাদ্যের ডেক হজরত আলাউদ্দিন ছাহেবের মস্তকে স্থাপন করিত, এই হেতু তাঁহার মস্তকের কেশগুলি উঠিয়া গিয়াছিল, তাঁহার ভ্রাতা আত্মীয়গণ আমির কবির ছিলেন, তিনি পীর ছাহেবের সঙ্গে লগ্নপদে তাঁহাদের বাটীর নিকট গিয়া গমন করিতেন, ইহাতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

এক দিবস কয়েক জন কলন্দর ফকির তাঁহার খানকাতে উপস্থিত হইলেন, তাহাদের সঙ্গে একটী বিড়াল ছিল, উহা তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ফকিরেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদের বিড়াল তোমার খানকা হইতে হারাইয়া গিয়াছে, তুমি উহা বাহির করিয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি কোথা হইতে বাহির করিয়া দিব। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, তুমি হরিণের শৃঙ্গ হইতে উহা বাহির করিয়া দাও, আমরা কি জানি, তুমি কোথা হইতে করিবা। হজরত বলিলেন, তুমি হরিণের শৃঙ্গ হইতে নিজের শাস্তি পাইবা। অন্য একজন অকথ্য ভাষায় বলিল, যদি তুমি না দাও, আমরা কোথা হইতে উহা পাইব ? আমাদের অণ্ডকোষ সমূহ হইতে কি উহা বাহির করিব ? হজরত বলিলেন ইহাই ভাল যে, তুমি নিজের অণ্ডকোষ হইতে পাইবে। যখন কলন্দর ফকিরেরা খানকা হইতে বাহির হইয়া আসিল, যে ব্যক্তি হরিণের শৃঙ্গের কথা বলিয়াছিল, একটী গরু আসিয়া শৃঙ্গ দ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অণ্ডকোষের নাম লইয়া ছিল, তাহার অণ্ডকোষদ্বয় ফুলিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল। হজরত আলাওল হক-অদ্দীনের লঙ্গর খানার এত অতিরিক্ত ব্যয় ছিল যে, খাস আম, দরিদ্র ও বিদেশী সহস্র লোক তথায় আহার করিত, যে কোন অভাবগ্রস্থ লোক আসিত বঞ্চিতাবস্থায় ফিরিয়া যাইত না। গৌড়ের বাদশাহ

সিকিন্দর শাহ এই সংবাদ পাইয়া হিংসাপরবশ হইয়া বলিলেন, আমার সমস্ত ধন ভাণ্ডার আলাউদ্দীনের ব্যয়ের হিসাবে দুই দিবসের খরচ হইবে না। এইরূপ অপব্যয়ী মানুষকে শহরে স্থান দেওয়া সঙ্গ ত নহে, এই হেতু তিনি হুকুম দিলেন যে, পীর ছাহেব যেন শহর হইতে বাহির হইয়া সোনারগাঁয়েতে বাসস্থান স্থির করেন। এই হেতু তিনি শহর হইতে বাহির হইয়া সোনরগাঁওতে থাকিলেন, তিনি খাদেমকে আদেশ দিলেন, দৈনিক খরচের পরিমাণ দ্বিগুণ বেশী কর। পীর ছাহেবের অন্য কোন আমদানি ছিল না, কেবল পিতৃগণের ওয়ারেছি স্বত্ব হইতে দুইটী বাগান পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার ফয়েজ ছিল, তৎপরে তিনি উহা এক ভিক্ষুককে দান করিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে সমস্ত ব্যয় গায়েব হইতে আসিত। গিয়াসউদ্দীন পাণ্ডুয়ার বাদশাহ হইলে, তিনি পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়া আসেন। তিনি ৮০০ হিজরীতে রজব মাসে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার মাজার পাণ্ডুয়াতে আছে। ইহা খজিনাতোল-আছফিয়া ও আখবারোল-আখাইয়াতে আছে। ইনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন, অবশেষে ব্রহ্মদেশ বাসী হইয়া ছিলেন।

তাঁহার এক শাগরেদ মখদুম সুলতান সৈয়দ আশ্‌ফার জাহাঁগির ছামনানি, ইহার মাজার ফয়েজ আবাদের কছৌছা শরিফে আছে। এক মুরিদ হজরত শাহ কামাল জহিরদ্দীন (রঃ) ইহার গোর বড় দরগাতে আছে। আর এক মুরিদ শাহ বোলাকি, তাঁহার মাজার পাণ্ডুয়ার পথিমধ্যে আছে। আর এক মুরিদ হজরত আহমদ দেমাশকি, তাঁহার মাজার পাণ্ডুয়াতে আছে।

তাঁহার প্রধান খলিফা তাঁহার পুত্র হজরত শেখ নুরোল হক উদ্দীন তিনি নুর কোৎবোল-আলম নামে প্রসিদ্ধ।

এক সময়ে একজন যোগী তাঁহার সহিত তর্ক করিতে উপস্থিত হয়, ইহাতে তিনি বলেন, মহানন্দ নদীর উপর পালঙ্গ

বিছাইয়া বছাছ করা হইবে। তিনি নদীর স্রোতের উপর পালঙ্গ স্থাপন করিলে, উহা ভয়ঙ্কর স্রোতের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। যোগী ইহা দেখিয়াই মুছলমান হইয়া যায়।

খজিনাতোল-আছফিয়াতে আছে, তিনি বড় খোদা প্রেমিক ও কারামতধারি পীর ছিলেন, তিনি পিতার উপযুক্ত খেদমত করিয়া কোতব হইয়াছিলেন, কোতবে-আলম উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি পিতার খানকার সমস্ত কার্য্য — ফকিরদিগের কাপড় ধৌত করা, ওজুর পানি গরম করা, পানি ও কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা, খানকার আব্বর্জ্জনা ও পায়খানার বিষ্ঠা পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সমাধা করা তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল।

এক দিবস তিনি পায়খানার বিষ্ঠা বাহির করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একজন দরবেশের পেটে বেদনা হইয়াছিল, হঠাৎ মল ত্যাগ করিয়া বসিল, ইহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ও কাপড় কলুষিত হইয়া গেল। পীর আলাওল হক ছাহেব ইহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন। যে সময় তিনি খানকার কাষ্ঠ বহন করিয়া আনিতেন তাঁহার বড় ভাই শেখ আ'জম খাঁ বাদশার উজির ছিলেন, এক দিবস তিনি কাষ্ঠের বোঝা স্কন্ধে ধারণ করিয়া যাইতে ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ইহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কত দিবস কাষ্ঠ বহন করিবে এবং পিতার নিকট এই বিপদে আবদ্ধ থাকিবে, তুমি আমার নিকট আইস, ধন ও মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অভাব রহিত করিয়া দিব। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তোমার নশ্বর ধন ঐশ্বর্য্যের আমার আবশ্যক নাই। খানকার কাষ্ঠ বহন তোমার মন্ত্রীত্ব পদ অপেক্ষা ভাল। শেখ রাকয়াতোদ্দীন ও শেখ আনওয়ার নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল, তিনি ৮৫১ হিজরীতে এন্তেকাল করেন, তাঁহার মজার পাণ্ডুয়াতে আছে।

হজরত নুর-কুতব-আলম গিয়া ছউদ্দীনের সঙ্গে যোধপুরের

নাগর নগরে, হামিদউদ্দীনের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। নুর-কুতব আলম, পাণ্ডুয়া নগরে বাদশাহ গিয়াছউদ্দীনের নিকট থাকিতেন। হামিদউদ্দীন পরে বীরভূম অঞ্চলে আসিয়া অনেক হিন্দুকে মুছলমান করেন। গিয়াছউদ্দীন, পিতার মৃত্যুর পর নয় বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গে ইহার রাজত্ব কাল ধরিলে, সাড়ে ষোল বৎসর হই। গিয়াছউদ্দীনের মৃত্যুর পর ছয়েফউদ্দীন তিন বৎসর ৭ মাস, ৫ দিন কাহারও মতে ১০ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে শমছউদ্দীন শাহ ৩০ বৎসর, ৪ মাস, ৬ দিবস রাজত্ব করেন। পরে গনেশ ১৪০৫ খৃঃ হইতে ১৪১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন, গিয়াছউদ্দীনের আমলে রাজসভার একজন প্রধান আমীর ছিলেন, ক্রমে রাজত্ব বিভাগ ও শাসন-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ইনি নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে গৌড়ের বাদশাকে মারিয়া গৌড়ের রাজা হন। রিয়াজছ-ছালাতীন প্রণেতা লিখিয়াছেন, রাজা কংসের (গণেশের) অত্যাচারে মুছলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। ছালাম না করার অপরাধে ইনি মইনউদ্দীন আব্বাছের পিতা শেখ বদর উল শিবির সন্নিবেশিত করেরন ইছলামকে নিহকত করেন। মুছলান উলামা শ্রেণীকে নৌকা সহ জলমগ্ন করেন। তাঁহার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য নুর-কুতুবুল-আলম ছাহেব জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শরকীকে আহ্বান করেন। ব্রািহিম কাজি শোবদদ্দীন জৌপুরের সঙ্গে পরমর্শ করেন। কাজি ছাহেব, দিন দুনইয়ার কল্যার হইবে বলিযা তাঁহাকে বাঙ্গালা আক্তরমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। ইনি সরাই-খিফরোজপুরে (পুরাতন মালদহের উত্তরাংশে) শিবির সন্নিবেহশিত করেন।

তখন রাজা নিজের ক্ষুদ্র শক্তিসহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলে, পরাজয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া হজরত কোতব ছাহেবের পদধুলি লইয়া ক্ষমা ভীক্ষা করে, তিনি বলিলেন, যদি তুমি মুছলমান হইতে পার, তবে সুলতানকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিব। রাণীর নিকট পরামর্শ লইলে, সে ইহা অস্বীকার করিল।

তখন রাজা নিজের পুত্র যদু সেনকে লইয়া কোতাব ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন রাজ্যভার আমার পুত্রের উপর অর্পণ করিতেছি, আপনি ইহাকে মুছলমান করিয়া লউন। তখন যদু সে মুছলমান হইয়া যান, তাঁহার মুছলমানি নাম হইল সুলতান জালালদ্দিন। এদিকে জৌপুরের সুলতান যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, কোতব ছাহেব বলিলেন, পূর্ব্বে এদেশের রাজা হিন্দু ছিল, এখন এদেশের বাদশাহ মুছলমান হইয়াছে, কাজেই একজন মুছলমানের বিরুদ্ধে জেহাদ করা জায়েজ নহে। বাদশাহ ইহা কোতব ছাহেবের একটী কুটচক্র ধারণা করিয়া বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া যাইতে কষ্টকর বুঝিয়া তাঁহার নিকট কারামত দেখিতে চাহিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, তোমরা দরবেশগণের প্রতি দোষারোপ করিও না, আর যদি কারামত দেখিতে চাহ, তবে কারামত এই যে, তোমরা জৌনপুর শহরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। ঘটনা তাহাই, হইল, বাদশাহ ও কাজি জৌনপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

সুলতান এবরাহিম শরকি, প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, রাজা গণেশ পুরায় অত্যাচার আরম্ভ করিল, সুলতান জালালদ্দিন ওরফে যদু সেনকে বন্দী করিয়া শুদ্ধি মন্ত্র পড়াইয়া হিন্দু করিয়া লইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে অহ্বান করিল, তাহারা বলিল, চল্লিশ দিবস চল্লিশটী গোচর্ম্ম পূর্ণস্বর্ণ ব্রহ্মণদিগকে দান করিলে, প্রায়শ্চিত হইবে। রাজা তাহাই করিল, কিন্তু সুলতান জালালদ্দিন কিছুতেই হিন্দু ধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত হইতে রাজি হইলেন না। সুলতান জালালদ্দিন বন্দীরূপে থাকিলেন, কোতব ছাহেবের ছোট পুত্র মখদুমশাহ আনওয়ার ছাহেব তাঁহাকে রাজা গণেশের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তিনি মোরাকাবায় বিভোর ছিলেন, হঠাৎ তিনি ঐ আত্মবিস্মৃতি অবস্থায় বলিয়া ফেলিলেন, যে দিবস তোমার হত্যা সাধন হইবে, সেই দিবস রাজার অত্যাচার নিবারিত হইবে। তৎপরে রাজা কোতব ছাহেবের ছোটপুত্র মখদুম শাহজাহেদ

(রঃ) কে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এক সময় রাজা মখদুম শাহ জাহেদ ছাহেবকে বলিল, জমির মধ্যে কোন স্থানে ধন-ভাণ্ডার আছে, তাহা আপনি আমাকে দেখাইয়া দিন। তিনি অন্তর শুদ্ধি দ্বারা অবগত হইয়া একটী স্থান দেখাইয়া দিলেন। রাজার লোকেরা সেই স্থান খনন করিয়া একটী ডেগ প্রাপ্ত হইলেন, তাহারা রাজার নিকট প্রকাশ করিলেন, উহাতে কেবল একটী আহরফি আছে। তৎশ্রবণে মখদুম জাহেদ ছাহেব বলিলেন, উহা আশরফিতে পূর্ণ ছিল, কিন্তু তোমার কর্ম্মচারিরা তৎসমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছে। রাজা ধারনা করিলেন, ইহা দ্বারা পরিণামে কোন লাভ হইতে পারে, এই হেতু তাঁহাকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু মখদুম আনওয়ারকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মুছলমানেরা রাজা গণেশের রাজধানী আক্রমণ করিলে, রাজা মখদুম আনওয়ার ছাহেবকে হত্যা করিয়া ফেলেন, সুলতান জালালদ্দিন প্রহরিদিগের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া রাজা গণেশকে বধ করিলেন, তখন সমস্ত ফাছাদ মিটিয়া গেল, সুলতান জালালদ্দিন ন্যায় ভাবে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন, উহা মুছলমানের রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল, তাঁহার মজার পাণ্ডুয়াতে আছে। মখদুম অনওয়ার শাহ শহীদ হইলে, তাঁহার লাশ মোবারক উড়িয়া পাণ্ডুয়াতে উপস্থিত হয়, এই স্থানে তাঁহার মাজার রহিয়াছে।

পাণ্ডুয়া হইতে ৬ মাইল দূরে মহিষখালি নামক স্থানে কাজি বাহাছ (রঃ) নামক এক বোজর্গ ছিলেন। পাণ্ডুয়া হইতে ৬ মাইল দূরে বোলবাড়ী নামক স্থানে হজরত শাহ আহমদ রেজা বেয়াবানি (রঃ) নামক দ্বিতীয় এক মস্ত অলী ছিলেন। এক সময় হজরত কোতব ছাহেব ও কাজি বাহাছ (রঃ) এই দুই বোজর্গের মধ্যে কোন মছলা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়, তাঁহারা উভয়ে হজরত শাহ আহমদ রেজা বেয়াবানি (রঃ) কে শালিষ স্থির করেন। উক্ত হজরত ছৈয়েদ ছাহেব নুরে-বাতেনি দ্বারা এই শালিষির কথা অবগত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা উভয়ে জবরদস্ত অলী, শালিষিতে কোন একপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, ফলে অন্য এক

জন মনঃক্ষুন্ন হইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, ইহাতে তিনি খোদার নিকট দোয়া বলিযয়ালেন, হে খোদা, উভয় বোজর্গের আমার নিকট উপস্থি হওয়ার পূর্ব্বে যেন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। খোদা তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন, তৎক্ষণাৎ মোরাকাবা অবস্থায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তাঁহার লাশের চারিদিকে উইপোকা এভাবে মাটি তুলিয়া সংগ্রহ করিল যে, যেন উহা কবরের ন্যায় হইয়া গেল, তৎপরে একজন হাফেজ ছাহেব উহা পোক্তা কবর করিয়া দেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জমির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কারামত। যখন কাজি বাহাছ (রঃ) কোতব ছাহেবকে বোলবাড়ীতে শালিষি মীমাংসার জন্য রওয়ানা হইতে বলেন, তখন হজরত কোতব ছাহেব নুরে-বাতেনি দ্বারা অবগত হইয়া বলেন, আপনি যাহার নিকট যাইতে চাহিতেছেন, তিনি-ত এন্তেকাল করিয়াছেন, না হয় আপনি দেখিয়া আসুন। কাজি বাহাছ (রঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার এন্তেকাল অবস্থা জানিয়া ফিরিয়া আসিয়া কোতব ছাহেবকে বলিলেন, যদি আপনার কোন খাদেম আমার দরগাতে উপস্থিত হয়, তবে যৌবন কালীন মৃত্যু দেখিতে পাইবে। কোতব ছাহেব বলিলেন, আমার খাদেমগণের আপনার দরগাতে যাওয়ার আবশ্যক হইবে না, কিন্তু আপনার গোর কখনও পোক্তা হইতে পারিবে না। অনেকে কাজি ছাহেবের এন্তেকালের পরে তাঁহার গোর পোক্তা করিয়া দিয়াছে, কিন্তু দিবসে উহা প্রস্তুত করা হইত, প্রভাতে দেখা যাইত যে, সমস্ত ইষ্টক বিক্ষিপ্ত ভাবে চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। কোতব ছাহেবের বদ দোয়াতে তখন তাঁহার কবর পোক্ত হইতে পারিল না।

পীর বিয়াবাণীর ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল।

আদিনা ষ্টেশন হইতে পাণ্ডুয়ায় যাইতে সৈয়দ শাহ আবদুর রাজ্জাক ছাহেবের মাজার আছে, ইহার প্রসিদ্ধ নাম পীর আহছান

শহীদ। ইনি কি জন্য কাহার দ্বারা শহীদ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।

পণ্ডোয়ার এলাকাতে মুফ্তিয়ে-দেমাশকি ছাহেবের মাজার আছে, তিনি দুরপীর নামে বিখ্যাত।

এই পাণ্ডোয়াতে পীর নজমদ্দিন, পীর কামারদ্দিন, পীর শামছদ্দিন, পীর বিবি ওয়ালেদা ও পীর বিবি আছেফা এই পাঁচজন অলীর মাজার আছে, তাঁহারা পাঁচ পীর নামে বিখ্যাত।

এখানে মাওলানা খলিলুর রহমান ছাহেবের মাজার আছে।

বড় দরগাতে ২০/২১/১২ শে রজব, ছোট দরগাতে ২৪/২৫ শে রজব, ও বোল বাড়ীতে সৈয়দ বেয়াবনি ছাহেবের ২৭শে রজব ওরছের মহফেল হইয়া থাকে।

তৎপরে তিনি আদিনা মছজেদ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, ইহা ৭০৭ হিজরীর ৬ই রজব গৌড়ের বাদশাহ শাহ সেকেন্দার বেনে হাজি এলইয়াছ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহার দক্ষিণ দিকে ৩৬০ গুম্বজের একটী বৃহদাকারের মছজেদ আছে, এখন ৪৫ গুম্বজ মাত্র বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট গুম্বজগুলি ভূপতিত হইয়াছে। এই মছজেদটী চারি অংশে বিভক্ত ছিল, এক অংশ আদানের বৃহৎ মছজেদের অনুকরণে, দ্বিতীয় অংশ খানায়কা'বার অনুকরণে, তৃতীয় অংশ বয়তোল-মোকাদ্দছের অনুকরণে ও চতুর্থাংশ মদিনা শরিফের মছজেদের অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহার প্রস্তর অঙ্কিত কারুকার্য্যগুলি দেখিলে, মুছলমানদিগের স্থাপিত বিদ্যার অসাধারণ ক্ষমতার কথা মনে পড়ে। মছজেদের বাহিরে বাদশার সিংহাসনের চারিপায়ার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে বাদশার বাসস্থান, ধনাগার, দপ্তরখানা ইত্যাদি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। গৌড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক মছজেদ

পরিলক্ষিত হয়। একটী পোক্তা দালানের উপরি অংশে আরবিতে লিখিত আছে,— ইহার মধ্যে কদমে রাছুল নামক একখানা পাথর আছে, মুছলমান বাদশাহ নসরৎ শাহ হজ্জে গিয়া উহা বহু অর্থ দ্বারা মদিনা শরিফ হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই পাথরখানা একজন হিন্দু লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়াছিল, তৎপরে একজন দীনদার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল, অমুক হিন্দু 'কদমে রাছুল' পাথর খানা পুষ্করিণীর অমুক স্থানে ফেলিয়া দিয়াছে, তুমি উহা উদ্ধার করিয়া উহার স্থানে রাখিয়া আইস। সে সন্ধান করিয়া ঠিক সেই নির্দ্দেশিত স্থানে উহা পাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। তৎপরে পুনরায় একজন হিন্দু উহা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে। এইবার সেই লোকটী স্বপ্নে উহা জানিয়া উঠাইয়া লইয়া নিজের বাটীতে রাখিয়া দিয়াছে।

গৌড়ের সাদুল্লাপুরে শেখ আখি ছেরাজের মজার আছে। শেখ আখি ছেরাজদ্দিন, ইনি বাদাউনের অধিবাসী ছিএলন, ইনি সুলতানোলমাশায়েখ নেজামদ্দিন আওলিয়ার প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন। যখন তিনি উক্ত হজরতের নিকট মুরিদ হইতে আসেন, তখন জাহেরি এলম কিছু শিক্ষা করেন নাই। সেই সময় উক্ত হজরত শেখ ফকরুদ্দিন জোবারিকে বলিয়াছিলেন, এই যুবকের প্রকৃতি ও আকৃতি অতি সুন্দর, কিন্তু কি করা যাইবে, সে এলম জানে না। এলম হীন দরবেশ শয়তানের ক্রীড়াপুতুল হইয়া থাকে। শেখ ফকরদ্দিন যখন দেখিলেন যে, হজরত সুলতানোল-মাশায়েখ সেরাজদ্দিনকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন, যদি আপনার হুকুম হয়, তবে আমি এই যুবককে কিছু দিবস সঙ্গে রাখিয়া এলম শিক্ষা প্রদান করিব। উক্ত হজরত বলিলেন, ইহা ভাল কথা, ভাল কার্য্যে এস্তেখারা করার আবশ্যক নাই। তৎপরে শিক্ষা দিতে তৎপর হন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে এইরূপ এলম শিক্ষা লাভ করিলেন যে, কোন আলেমের তাঁহার সহিত তর্ক করার শক্তি ছিল না। তৎপরে তিনি হজরত সুলতানোল-মাশায়েখের নিকট

মুরিদ হইয়া জাহেরি ও বাতেনি উভয় এলমে পারদর্শী খেলাফত প্রাপ্ত হইলেন এবং বঙ্গদেশ হেদাএত করিতে আদিষ্ট হইলেন। হজরত সুলতানোল-মাশায়েখ বারম্বার বলিতেন, তিনি হিন্দুস্থানের দর্পণ। তিনি ৭৫৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন, তাঁহার মাজার মালদহ জেলার গৌড়ের সাদুল্লাহপুরে আছে। তথায় এক বিরাট মছজেদ আছে। ইনি ইলিয়াস শাহের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

গৌড়ের পিরোজপুরে শাহ নেয়ামতুল্লাহ দরবেশের মাজার আছে, ইনি গৌড়ের বাদশার পীর ছিলেন। গৌড়ের একজন মুছলমান বাদশাহ প্রকৃত পীর অলি পরিক্ষা করিয়া মুরিদ হওয়ার জন্য বিষ মিশ্রিত শরবত পান করিতে দিতেন, যে কোন দরবেশ তথায় উপস্থিত হইত, তিনি উহা বলিলে কেহ উহা পান করিতে সাহসী হইত না। যখন শাহ নেয়ামতুল্লাহ দরবেশ তথায় আগমন করিলেন, বাদশাহ তাহাকে উক্ত শরবত পান করিতে দিলেন, তিনি উহার কিছু অংশ পান করিলেন এবং কিছু অংশ একটা খারাপ পানির পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিলেন, ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইল না। এবং পুষ্করিণীর পানি মিষ্ট হইয়া গেল। সেই সময় বাদশাহ তহার নিকট মুরিদ হইয়া গেলেন। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, দরবেশ নেয়ামতুল্লাহ শাহ সুজাকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন। তাই শত্রু দমনার্থ তাহার আদেশে সেনাপতি দিলীর খাঁ উক্ত দরবেশের বধ সাধনার্থ গৌড়ে উপস্থিত হইলে, তাহার পুত্র শাহের ইয়ার খাঁর নাকি রক্ত বমন করিয়া মারা যান। ইহাতে দিলীর খাঁ দরবেশের নিকট ক্ষমা লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান।

শাহ সাহেব গোর খনন করাইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হন নাই।

মালদহের মোল্লাটুলিতে পীর সুলতানের শেহাবুদ্দিন ছাহেবের মাজার আছে।

পুরাতন মালদহের এক ক্রোশ দক্ষিণে লঙ্কাপতি নামক একজন পীরের মাজার আছে।

টাঁড়াতে মীর মালতী নামক একজন পীরের গোর আছে।

সমাপ্ত